সচিত্র মাসিক-পত্র

— সম্পাদক —

মুরলীধর বসু　　শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়　　প্রেমেন্দ্র মিত্র

—কর্ম্ম-সচিব—

শিশিরকুমার নিয়োগী

প্রথম বর্ষ

১৩৩৩ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র।

বরদা এজেন্সী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বার্ষিক সডাক ৩।৹　　প্রতিসংখ্যা।

সূচী

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দের সৌজন্যে।

কালি-কলম

১ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল [১ম সংখ্যা

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শহরের কাছাকাছি, অথচ শহর নয়। পাঁচ-সাতটা গোলদারি দোকান চলে। গ্রামখানি বড়।

ধরমতলায় তরি-তরকারির হাট বসে। ভিন্ন গ্রাম হইতে চাষার মেয়েরা মাথায় মোট লইয়া মরসুমি ফসল বিক্রি করিতে আসে। কিন্তু সম্প্রতি তাহারা আর আসিতে চায় না। গাঁয়ের কয়েকটা ছোক্‌রা নাকি ভারি বজ্জাত।

মেয়েদের আসা বন্ধ হইয়াছে।—পুরুষেরা আসে।

কার্ত্তিক মাস। মাঠের নূতন বেগুন হাটে আসিয়াছিল। খবর পাইয়া গণেশ পাঁড়ে সেদিন নিজেই হাট করিতে গেল।

বেগুন-ওয়ালাকে দেখাই যায় না। গাঁয়ের মেয়েরা তখন তাহাকে তাহার ঝুড়ি-সমেত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গণেশ তাহার গোঁফ-জোড়াটা একবার চুম্‌রাইয়া লইয়া জোর-গলায় হাঁকিল, "দর কত—দর কত হে বেগুনের?"

জবাব আসিল না,—সম্ভবত গোলমালে সে শুনিতে পায় নাই।

"দেখাগ্ দেখ চাষার! আরে—এই!"

চাষা মুখ তুলিয়া চাহিল।

"দর কত?—বেগুন?"

"তিন আনা ঠাকুর, তিন আনা সের।—ওগো, ওঠ ঠাক্‌রুণ, ওঠ তুমি। ফাউ পায় না, তিনটি বেগুনের ফাউ নাই।"

গণেশ বলিল, "তিন আনা কি,—তিন আনা কি আবার? সোনা-রূপো নয়—মাঠের বেগুন।"

অন্য খরিদ্দারের বেগুন ওজন করিতেছিল, ঘাড় নাড়িয়া চাষা বলিল, "হাঁ বাবু, তিন আনা। যুদ্ধুর বাজার আজকাল। ঝিঞের দরুণ সেদিনকার সেই চার-আনা পাব তোমার কাছে।"

"পাবি ত' কি পালিয়ে গেল নাকি রে হারামজাদা, চাষা!"

"গাল দিও না তুমি, গাল দিও না ঠাকুর। গরীব লোক, আমাদের পয়সা ফেলে দাও।"

কথাটা সে একটুখানি অপ্রিয়ভাবেই বলিয়া ফেলিল।

"আমার দুয়োরে এসে' আবার আমাকেই জোর দেখ বেটার!"—গণেশ পাঁড়ে অগ্রসর হইয়া গিয়া ঠাস্ করিয়া গালে তাহার এক চড় বসাইয়া দিল।—"ভাগ্ শালা, ভাগ!"

"মারবে নাকি তুমি?"—বলিয়া বুক ফুলাইয়া চাষাও উঠিয়া দাঁড়াইল।

কনৌজ ব্রাহ্মণ—বহুদিন বাংলায় বাস করিয়া না হয় বাঙ্গালীই হইয়া গেছে! গণেশ পাঁড়ের বুকখানাও কম চওড়া নয়। লাথি মারিয়া বেগুনের ঝুড়িটা সে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

লুট-করা মাল কুড়াইয়া লইবার লোকের অভাব সেখানে ছিল না। মিনিটকয়েকের মধ্যে যে যাহা পাইল কুড়াইয়া লইল। গণেশ পাঁড়ে চালাক লোক। বচসা করিল, হাঙ্গামা করিল, লোকটাকে হাতের সুখে ঘা-কতক বসাইয়াও দিল, মাল লুট করিল, আবার সকলের সঙ্গে নিজেও এক আঁচল বেগুন কুড়াইয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

চাষা মার খাইয়া কাঁদিতেছিল; দশজনকে শুনাইয়া বলিল, "জমিদারের কাছে যাই—এর বিচের হোক।"

কে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, জমিদারের কাছে গিয়া কোনও লাভ নাই। গণেশ পাঁড়ে ভয়ানক লোক।

—ধরম্‌তলার হাট আর বসে না।

গ্রামের দক্ষিণে রেল-ষ্টেশন। দু'তিনটা বড় বড় কল-কারখানাও বসিল। হাট-বাজার দোকান-দানি লোকজনের বাস-বস্তিতে জায়গাটা দিনে-দিনে বেশ জমকালো রকমের হইয়া উঠিতেছে। গাঁয়ের দক্ষিণ তরফ্‌টা ঘিরিয়া লইতে আর বেশি দেরি নাই।

পূব, পশ্চিম আর উত্তর,—এই তিনটা দিক এখনও ফাঁকা। চাষ-আবাদের জায়গা-জমিও বিস্তর। পশ্চিমে ছোট একটি নদীও আছে। কিন্তু পাকা ধান একবার ঘরে ঢুকিলে সেদিকে আর কেহ ফিরিয়াও তাকায় না, খোরাক্‌ বাদে অবশিষ্ট ধান-চাল শহরে বিক্রি করিয়া আসে,—জামা কেনে, জুতা কেনে, চুরুট ফুঁকে, মদ খায়, গাঁজা টানে,—নিতান্ত অভাব হইলে কল-কারখানায় সাড়ে বত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়া ফিটার্‌ মিস্ত্রির কাজ শিখিতে যায়। এ-গ্রাম হইতে তিনজন গিয়াছে, কিন্তু সেই তিনজনেই তিনজন।

—"আগে তিন ছিলুম্‌ গাঁজায় ভূত চার ছিলুম টানে কার বাবার সাধ্যি, আর এখন,—তিন ছিলুমই টানো, আর তিন-তিরিক্ষে ন' ছিলুমই টানো বাছাধন, দেখতে-না-দেখতে নেশা হয়ে যাবে—ঠাণ্ডা জল। শালা লোহা-লক্কড়ের এমনি বিছ্‌ছিরি শব্দ······দু-আনা রোজগার করতে গিয়ে চার আনাই মাটি।"

কাজ হইতে ফিরিয়া মনু পৈরুণ্ডি সেদিন ইহাই বলিল। কথাটা শুনিয়া অবধি অনেকের উৎসাহ কমিয়া গেছে, এবং ইহার পরেও যে এ-গ্রাম হইতে আর কেহ সেখানে বেকুব্‌ বনিতে যাইবে—তাহার আশা-ভরসা খুবই কম। তবে সুসংবাদের মধ্যে এই যে, পচু গাঙ্গুলি গত বৎসর কালীয়দমনের যাত্রা শুনিতে গিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে যে হারমোনিয়ামখানি গায়ের-কাপড় ঢাকা দিয়া রাতারাতি সরিয়া পড়িয়াছিল, অদ্যাবধি তাহার খোঁজ-খবর কিছু হইল না—ভালই বাজিতেছে; তাহার উপর ক্ষুদু চাটুজ্যের ডুগি-তবলাটি সম্প্রতি মেরামত করানো হইয়াছে, রাখহরি বোরেগীর খঞ্জনি, মন্দিরা—সবই মজুত, এই সব যন্ত্রপাতি থাকিতে গ্রামে একটি যাত্রা কিম্বা থিয়েটারের দল যে কেন চলে না, আজকাল তাহারই পরামর্শ চলিতেছে। বেনোয়ারী ওস্তাদ পরের দলে ঠিকা-চুক্তিতে বেহালা বাজাইয়া বেড়ায়, গ্রামে যাত্রার দল হইলে তাহার ঘর-বার দুই-ই হয়, কাজেই একাজে তাহারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। এমন-কি, দলটার একটুখানি নাম-ডাক হইয়া পড়িলে রাত-পিছু দু-এক টাকা সকলেই পাইবে,—নেশা-ভাং ত' আছেই।

মহা উৎসাহে ছোক্‌রারা এখন চাঁদা আদায়ের খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

ধরমতলার পাশে মস্ত বড় যে গোলদারি দোকানটি

চন্দে, সেখানে কাগজ-কলম শেলেট্-পেন্সিল ত' আছেই, আজকাল আবার কেমিকেলের গয়না, গেঞ্জি-মোজা, সাবান জরদা—সবই মিলিতেছে। এবং এই সবের চলন্ হওয়াতেই নাকি সজনী ময়রার অন্ধকার খুপ্রির উপরেও ইঁটের দোতলা উঠিল,—এমনি কথা অনেকেই বলাবলি করে। কিন্তু কেনারাম মুখুজ্যে বলে, "না হে না, উঠুক। দোতলা ছেড়ে' তেতলাই উঠুক্ না! কথায় আছে, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পুড়ে' যাবে,—আর সেই যে কি হে —অতি ছোট হ'য়ো না……। চুরির মাল-বেচা পয়সা বাবা—এমন তুমিও হতে পার আমিও হতে পারি।"

সেদিন সকালে কেনারাম মুখুজ্যে সেই দিক দিয়াই আসিতেছিল। রোজ দুবেলা তাহাকে এইদিক দিয়া একবার করিয়া আসিতে হয়। আফিংখোর মানুষ,—সকাল-বিকাল একটুখানি চা না হইলে চলে না। অথচ অনেক কষ্টে, তাহাদের দশজনের অনেক বলা-কওয়ার পর, মাত্র এই সেদিন—গত বৎসর পৌষ মাসে, দুরন্ত শীতের এক স্মরণীয় প্রাতঃকালে সজনী দত্তকে এই আফিং-এর অভ্যাসটি ধরানো হইয়াছে। তাহারও চা-চিনির অভাব নাই। দোকানের চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া চির-পুরাতন চটের আসনখানির উপর একবার চাপিয়া বসিতে পারিলে চায়ের বরাদ্দ কাহারও ফাঁক পড়ে না। অন্তত কাঁশার বাটির একবাটি করিয়া মিলিবেই।

কপিল চক্কোত্তি তখন সবেমাত্র তাহার কোঁচার খুঁটের উপর বসাইয়া, গরম কাঁশার বাটিটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। কি-একটা ব্যারামের জন্য কেনারামের চোখের পাতা দিনরাত মিট্ মিট করে, ভাল দেখিতেও পায় না। কপিলকে সে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। বলিল, "কে হে, বদি? চারির জন্যে বিস্কুট আনতে দিলাম সেদিন তোমার ভাই-পোকে। পাঁচ আনায় তিনটি বিস্কুট এনেছে।—বলি, ওহে সজনী, শোন শোন, পাঁচ আনায় তিনটি বিস্কুট, তোমরা দোকানদার মানুষ—শুনেছ কখনও?"

চারিদিকে অগোছালো জিনিষ-পত্রের মাঝখানে বসিয়া সজনী খরিদ্দার বিদায় করিতেছিল। বলিল, "চাকুর আবার কি হলো মুখুজ্যে?"

দরজার একপাশে পিতলের একটি ঘটিতে কেনারামের জন্য চা ঢাকা ছিল, বাটির উপর ধীরে-ধীরে চাটুকু ঢালিয়া বলিল, "জ্বর—"

ভিতর হইতে জবাব আসিল, "হুঁ মুখুজ্যে, জ্বর আজকাল সবারই। আমাদেরও চার-পাঁচটা ছেলে ধট্-পট্ করছে।"

কিন্তু একচুমুক চা মুখে দিয়াই কেনারামের মুখখানা কেমন যেন একরকমের হইয়া গেল, বলিল, "সজনী, এ কি হে, চা যে তোমার ঠাণ্ডা জল! না আছে মিষ্টি না আছে—"

সজনী একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই বলিল, "সে কি মুখুজ্যে! ওই যে কপিল-ঠাকুরের চায়ে 'ভাপ্' উঠছে এখনও!"

কপিলের বাটির উপর তখনও ধোঁয়া উঠিতেছিল, কেনারাম তাহা দেখিতে পায় নাই। এইবার ভাল করিয়া তাহার মিট্মিটে চোখ দুইটাকে একটুখানি চাড়া দিয়া কেনারাম সেইদিক পানে তাকাইল। বলিল, "কে? কপ্লে নাকি? তবে আর বল্তে হবে কেন সজনী, শালা ও পাড়া থেকে এসেছে এই পাড়ায় চা মার্তে। দিয়েছে হয়ত আমার চায়ে জল ঢেলে বাড়িয়ে।"—বলিয়াই সে আর-এক চুমুক ঢুক্ করিয়া গিলিয়া বলিল, "হুঁ, ঠিক—"

কপিল চক্কোত্তি লোকটা একটুখানি ক্ষ্যাপাটে-গোছের। বয়স কম নয়—পঞ্চাশের কাছাকাছি, সজনী কেনারামের চেয়ে কিছু বড়ই হইবে। কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত বেঁটে, মুখে একরাশ দাড়ি-গোঁফ, চেহারাটা নিতান্ত খারাপ।

ঘরে বৌ আছে। বৌ ভারি দজ্জাল।

ছেলে পুলে হয় নাই। হইবার আশাও নাই।

বৌ বলে, "বসে' বসে' ভাত খাবি ত' দু'কলসি জল নিয়ে আয় পুকুর থেকে।"

পিতলের বড় বড় দুইটা কলসি লইয়া কপিল স্নান করিতে যায়।

চা খাইতে চাহিলে বলে, "লাট-সায়েবের মুরোদ কত? কারও ঘরে খেগে যা।"

দুধ-চিনি না পাইলে অন্তত নূন দিয়াও গরম চায়ের জল একটুখানি গ্রামের প্রায় সকলেই খায়। কপিলেরও বাদ পড়ে না। যেখানে যায় অন্তত জোর-জবরদস্তি করিয়াও একটুখানি খাইয়া আসে।

অনেক চেষ্টা করিয়াও গরম চা-টুকু কপিল তখনও পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারে নাই।

কেনারাম বলিল, "হারামজাদা এ-পাড়ায় মরতে কেন তুই,—এ-পাড়ায় কেন?"

কপিল এতক্ষণ কথা কহে নাই, একমনে চা খাইতেছিল। এইবার ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়া ফেলিল।

কেনারামের তখন আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে আর রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না; চায়ের বাটিটা কপিলের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নে শালা নে তবে তুই-ই খা।'

বাটিটা ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল, কপিলের কাপড়টাও ভিজিয়া গেল। তা যাক্। ইহার জন্য গরম চা ছাড়িয়া ওঠা যায় না। কপিল উঠিল না। বাটির অবশিষ্ট চা-টুকু নিঃশব্দে শেষ করিয়া বাটিটি সেইখানে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "নে কেনারাম, ধুয়ে রাখ্।"

একে সে রাগিয়াই ছিল তাহার উপর কপিলের এই কথাটা শুনিবামাত্র সে তাহাকে মারিতে গেল।

কপিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাস্তায় গিয়া নামিল, বলিল, "গাড়ুর জলটা ত' খেলি।"

রাগে কেনারামের চোখের পাতা দুইটা ঘন ঘন নড়িতেছিল। বলিল, "বামুন-ঘরের গরু—।" রাগে তাহার আর কথা বাহির হইল না, চোখের পাতার সঙ্গে ঠোঁট-দুইটাও নড়িতে লাগিল।

ব্যাপারটা দেখিবার জন্য দোকানের ভিতর হইতে সজনী ও তাহার কয়েকজন খরিদ্দার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভুবন স্যাকরা কয়েক-পয়সার সুপারী খরিদ করিয়া সেগুলি তখনও বাঁধিবার অবসর পায় নাই, তাহাই সে তাহার কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "কপিলের বাপ একজন পণ্ডিত ছিল গো—সংস্কিতো জানতো।"

আর একজন কে বলিল, "আর ওই তার ছেলে।"

কথাটা শুনিয়া রাস্তার উপর হইতে কেনারামকে উদ্দেশ করিয়া কপিল বলিতে আরম্ভ করিল, "কেনা, কেনৌ, কেনাঃ—কেনাম্, কেনৌ, কেনাঃ—কেনেন, কেনাভ্যাম্, কেনেভ্যঃ।"

এবং ইহাই বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

কেনারাম ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল; সজনী দত্ত তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কর কি মুখুজ্যে, ও কি মানুষ?" একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিল, "বৌকে লুকিয়ে ভাতের চা'ল চুরি করে' আনে,—এনে' ছোলাভাজা কিনে' খায়।—ওরে ও জগন্নাথ! তোর মাকে বল্ ত' বাবা, মুখুজ্যের জন্যে আর একবার চায়ের জল চড়িয়ে দিক্।"

কথাটা শুনিয়া এতক্ষণে মুখুজ্যে-মহাশয়ের যেন ধাত আসিল; পুনরায় যথাস্থানে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিল, "শালা ক্ষ্যাপা, শালা ক্ষ্যাপা, ক্ষ্যাপা রয়েছে শালা আসল বদমায়েস্।"

সুমুখের রাস্তা দিয়া ঝুড়ি মাথায় করিয়া একটা লোক পার হইয়া যাইতেছিল। কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি তরকারি হে, কি তরকারি? নামাও না বাবা!"

লোকটা চলিতে চলিতে জবাব দিল, "এ তরকারি খেতে পারবেন না বাবু—"

"কি এমন তোমার কফি-মূলো আছে হে, যে খেতে পারব না? নামাও, নামাও—কেউ মার্-ধোর করবে না—নামাও।"—বলিতে বলিতে কেনারাম মুখুজ্যে উঠিয়া গিয়া তাহার ঝুড়ির পিছনের দিকটা ডান হাত দিয়া টানিয়া ধরিল।—"শালা গণেশ পাঁড়ের দায়ে হাটটি উঠে গিয়ে আমাদের এই জ্বালা!"

"মুরগীর ডিম আছে বাবু, এই দেখুন না!"—বলিয়া লোকটা তাহার মাথা হইতে ঝুড়িটি নামাইল।

কেনারাম মুখুজ্যে লাফাইয়া উঠিল :

"মুরগীর ডিম !"

"হাঁ বাবু, ইষ্টিশনে সায়েবদের জন্যে।"

"মুরগীর ডিম ত' এ রাস্তায় কেন ? এই বামুণের গাঁয়ের মাঝে-মাঝে, এই ঠাকুর-দেবতার থানের উপর দিয়ে—?"

কেনারাম মুখুজ্যের চোখের পাতাদুইটা যেন সেকেণ্ডে দশবার করিয়া উঠা-নামা করিতে লাগিল।

লোকটি পুনরায় ঝুড়িটি মাথায় তুলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, কেনারাম মুখুজ্যে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, সেটি হচ্ছে না বাপ্ধন, দাঁড়াও। সকাল বেলায় মুরগীর ডিম ছুঁইয়ে ত' আমার চান্ ঘটালে, তার উপর আস্পর্দ্ধাও ত' তোমার কম নয় বাবা! দাঁড়াও—ওরে কে আছিস্ এখানে, ডাক্ ত' গণেশ পাঁড়েকে !"

"গণেশ পাঁড়েকে কেন ? এই যে আমরা রয়েছি।"—বলিয়া হরেকৃষ্ণ তাঁতি তাহার মাথা হইতে যাত্রার দলের দরুণ আদায়ী-চাউলের ডালাটি নামাইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিয়াছিল, লোকটা বুঝি তরকারি বিক্রি করিতে আসিয়া দাঁও বুঝিয়া চড়া দাম হাঁকিয়াছে। বলিল, "ও-সব চল্‌বে না কত্তা, এ-গাঁয়ে একদর।"

এ-পাড়ার ও-পাড়ার আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণের ছোক্‌রা, যাত্রার দলের চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতেছিল। হরেকৃষ্ণর পশ্চাতে তাহারাও আসিয়া পৌছিল।

রাখহরি পাঠক পশ্চিম-পাড়ার লোক। বলিল, "চল হে চল, আমাদের পছি-পাড়ায় চল।"

পান্থ গাঙ্গুলি বলিল, মাইরি আর-কি! না হে না, তার-চেয়ে চল আমাদের মনসা-ঘরে,—সাধারণী-জায়গা বাবা, কেউ টুঁ শব্দটি করবে না।"

কেনারাম মুখুজ্যে বেগতিক দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আ—মলো যা! আচ্ছা বেকুব ত' তোরা! এঁড়ে না বক্‌না আগে ভাল করে' দেখ্ নারে বাবা, তারপর কথা কইবি।—মুরগীর ডিম এনেছে বেচ্‌তে, তা জানিস্ ?"

"মুরগীর ডিম !"

একসঙ্গে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল।

কেনারাম মুখুজ্যে বলিল, "তবে আর বলছি কি শালাকে। এই বামুনের গাঁ, তার উপরে আবার এই ধরম্‌তলা……"

"ওই! তবে মারো হে শালাকে।" বলিয়া রাখহরি পাঠক দূরে দাঁড়াইয়া নাক ঝাড়িতে লাগিল।

পান্থ গাঙ্গুলি সায় দিয়া, বলিল, "হাঁ ঠিক্। দাও সেই চাষার মতন করে'।"

হরেকৃষ্ণ তাঁতি বলিল, "তার চেয়ে কিছু অর্থদণ্ড হোক্।"

"তবে তাই কর যা-খুশী, কিন্তু ষোল-আনার কম ছেড়ো না তা বল্‌ছি।"—কেনারাম মুখুজ্যে একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

সজনী ময়রা পুনরায় দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, বলিল, "গরীব লোক,—যা বেটা তবে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে ওই বাবা-ধম্মরাজকে পেনাম করে' যা, বল্, আর কখনও একাজ করব না।"

এতগুলা লোকের ব্যাপার দেখিয়া ডিমওয়ালা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাখহরি পাঠক আগাইয়া আসিয়া বলিল, "শুধু জরিমানা নয়, নাক্‌খৎ দাও আড়াই-হাত।"

"তবে এই চার গণ্ডা পয়সা লেন বাবু।"—বলিয়া অতি কষ্টে লোকটি তাহার কোঁচড় হইতে দুইটি দু-আনি বাহির করিয়া সজনী ময়রার হাতে দিয়া তাহাকেই একটি প্রণাম করিল।

"আমাকে পেনাম করে না, যাও, আর রামপাখীর ডিম-ফিম্ নিয়ে এসো না এ-গাঁয়ে।"—বলিয়া সজনী দত্ত দুয়ানি দুইটি কেনারাম মুখুজ্যের হাতে দিয়া পুনরায় দোকানে গিয়া ঢুকিতেছিল, জগন্নাথকে চা আনিতে দেখিয়া বলিল, "দাও মুখুজ্যেকে দাও।"

রাখহরি পাঠক হাত পাতিয়া বলিল, "পয়সাগুলি ট্যাঁকে গুঁজো না মুখুজ্যে—দাও গাঁজা আনি।"

চোখ মিট্‌মিট্‌ করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া কেনারাম বলিল, না রে না, গাঁজা আনে না, সাধারণীর পয়সায় গাঁজা আনে না।"

পানু গাঙ্গুলি বলিল, "বেচু ময়রা বেগুনি ভাজছে গরম গরম—"

"সেই ভাল।"

কেনারাম এক হাতে চায়ের গ্লাসটি ধরিয়া অন্যহাতে দু-আনি দুইটি রাখহরির পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

রাখহরি সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে বলিল, "না মুখুজ্যে, দুই-ই আসুক্,—দু-আনার তেলে-ভাজা, আর দু-আনার—"

চায়ের গ্লাসে বারকতক ফুঁ দিয়া কেনারাম একবার রাখহরির দিকে সহাস্যে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তবে তা-ই যা, কিন্তু ভাল দেখে বেশ সোঁটা সোঁটা বেছে বেছে এক দু-আনি ওজন করে' আনিস বাপু,—আর ওই বরি-বামনীর কাছে আনিস্‌নি যেন—বেটি ভারি চোর।"

চুরি করিয়া গোপনে গাঁজা-আফিং বেচার ব্যবসাটা তখন এ-গ্রামে খুব জোর চলিতেছে।

চাউলের ডালাটি সজনী ময়রার দোকানের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া হরেকৃষ্ণ কেনারামের কাছ হইতে হাত খানেক্ দূরে গিয়া উবু হইয়া বসিল। বলিল, "আজ আচ্ছা করেছেন মুখুজ্যে, এমনি না করলে কি আর গাঁ জব্দ হয়,—আচ্ছা করেছেন ডিমওয়ালাকে।"—বলিয়া সে ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সে হাসি থামিলে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আপনার ওই গেলাসের পেসাদ একটুখানি···মানে, রোজ সকালে আমার এক গেলাস করে' চাই-ই, তবে কিনা বাসি-দুধে চা তেমন সুবিধে হয় না। বুঝেছ গাঙ্গুলি—"

পানু গাঙ্গুলিকে উদ্দেশ করিয়া আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তেলে-ভাজার ঠোঙা হাতে লইয়া রাখহরিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে সব বন্ধ হইয়া গেল।

রাখহরি বলিল, "দোকানে বসে' ছিল শালা কপ্‌লে,—নিলে দুটো খাঁ ক'রে তুলে।"

"তুই দিলি কেন ওকে?"—বলিয়া গেলাসের অবশিষ্ট প্রসাদটুকু হরেকৃষ্ণর হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া, চোখের পাতা দুইটা মিট্ মিট্ করিতে করিতে কেনারাম একবার রাখহরির মুখের পানে তাকাইল।

"কি করব, এক হাতে এই—আর এক-হাতে এই—"—বলিয়া রাখহরি তাহার ডানহাতের ঠোঙা ও বাঁ-হাতের চোরাই-পুঁটুলি দেখাইয়া দিল।

তেলে-ভাজার ভাগ-বণ্টন পানু গাঙ্গুলি-ই করিয়া দিল। পোঁটলা খুলিয়া রাখহরি গাঁজা টিপিতে বসিল।

প্রসাদ পাইয়া হরেকৃষ্ণ তাঁতি তাহার আনন্দের উচ্ছ্বাস আর দমন করিতে পারিল না। সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "সে দিন হুগ্লফুলি গেলাম একটা কাজে। শুনুন মুখুজ্যে, শুনুন! সন্ধ্যেবেলা। রেবতী পোদ্দারের সেই যে দোকানটা আছে, তারই সামনে, গাঁয়ের সেই রাস্তাটার একপাশে ক'জন বামুণদের ছোক্‌রা বসেছিলেন। রাশ গোসাঁইকে চেনেন ত'? আমি গিয়েছিলাম পাঁটা আন্‌তে তারই ঘরে। আমিও সেইখানে বসে। এমন সময় হলো কি,—কোথাকার কে একটা লোক জুতো পায়ে দিয়ে মচ্ মচ্ করে' তাদের সামনে দিয়েই পেরিয়ে গেল। একজন জিজ্ঞেস্ করলে, কোথা বাড়ী?"

'আজ্ঞে পড়াশ্ কোল্।'

'তোমরা?'

'আমরা শৌ—মণ্ডল।'

"শুঁড়ি, বেটাচ্ছেলে শুঁড়ি—বুঝেছেন কিনা! আর যায় কোথা! তড়াক্ একজন উঠে গিয়ে ধর্‌বি ত' ধর্ বেটার একেবারে টুঁটিতেই। তা—পরে বাবু, মার্ ত' মার্ একেবারে বেদম্ মার্—জুতো খুলে দুমা-দুম্ দুমা-দুম্··· বেটা শুঁড়ি! বেটার জল ছুঁলে পাচ্চিত্তি করতে হয়,—আর বেটা কিনা অতগুলি বামুণের মাঝ দিয়ে, জুতো পরে পেরিয়ে গেল!"

"নোয়া শালা, মাথা নোয়া"—বলে' ত' দিলে একজন ছোকরা হুম্ করে' তার ঘাড়ে এক কিল মেরে মাথাটা নুইয়ে। বাস্! বেটা সাত হাত নাকখৎ দিয়ে সটান লম্বা হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে সেদিন উঠে গেল। সেই থেকে সব জব্দ,—বুঝেছেন মুখুজ্যে, হয়েফুলির বামুণদের নাম শুনলে দশখানা গাঁ একেবারে টঁটরস্থ হয়ে ওঠে। বুঝেছেন?"—বলিয়া সে হাতের গ্লাসটি নামাইয়া দিয়া গাঁজার প্রসাদ পাইল।

যাত্রার দলের জন্ত আদায়ী-চালগুলি তাহারা সজনী ময়রার দোকানে বিক্রি করিতে আসিয়াছিল। প্রসাদ পাইয়া ডালার চালগুলি মাপিবার জন্ত দোকানের ভিতর হইতে হরেকৃষ্ণর ডাক পড়িল।

গণেশ পাঁড়ের ছোট ছেলেটা তেলের একটি ছোট ভাঁড় লইয়া সজনীর দোকানে তেল কিনিতে আসিয়াছে।

বাহিরে বসিয়া রাখহরির বেগুনি-সেবা চলিতেছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সে এই ছেলেটাকে হাতের ইসারা করিয়া বলিল, "এই ভ্যাঁট্‌রা! শোন্!"

ছেলেটা সেইদিক পানে ফিরিয়া তাকাইল।

রাখহরি তাহার বাঁহাতের ঠোঙ্গা হইতে একটি বেগুনি তুলিয়া হাত বাড়াইয়া ছেলেটাকে দেখাইল, বলিল, "খাবি? গরম বটে।"

ছেলেটা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া হাত বাড়াইল।

"ছাই খা, পিণ্ডি খা, গরু খা।"—বলিয়া রাখহরি তাহার হাতের বেগুনিটি টুপ্ করিয়া নিজের মুখে পুরিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে—।

মুরগীর ডিম ছুঁইয়া স্নান করিবার জন্য কেনারাম মুখুজ্যে উঠিয়া গেল। অন্যত্রে চাঁদা আদায়ের চেষ্টায় রাখহরি, পান্নু ও হরেকৃষ্ণ তখন চলিয়া গিয়াছে; এমন সময় গণেশ পাঁড়ে তার সই ভ্যাঁট্‌রা ছেলেটার হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে অত্যন্ত দ্রুতপদে সজনী ময়রার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা—কোথা সব? কোথায় বেগুনি করছে—কার ঘরে?"

দোকানের ভিতর হইতে সজনী বলিয়া দিল, "আমা-দের বেচারামের ঘরে দেখ পাঁড়ে।"

"বেচা! যাই শালা বেচাকে একবার—বেগ্‌নি করা বার করছি, সকাল বেলা ছেলে-কাঁদানো— চল্, চল্ বেটা চল্।"—বলিয়া ভ্যাঁট্‌রাকে আবার টানিতে টানিতে গণেশ বেচারামের দোকানের দিকে চলিতে লাগিল।

বেচু ময়রা তখন তাহার রাস্তার ধারের ছোট চালাটির একপাশে বসিয়া বেগুনি ভাজিতেছিল।

গণেশ পাঁড়ে হাঁকিল, "বেচা!"

উনান হইতে আগুন তুলিয়া, কাশী হাজরা কলিকায় আগুন চড়াইতেছিল, হাত হইতে তাহার কলিকাটা কাঁপিয়া পড়িয়া গেল।

পাঁড়ে বলিল, "দেখ্ বেচা, 'এন্‌চ্যাণ্টমেণ্ট অফ চিল্‌ড্রেন্' বলে' যদি মাজেষ্টরীতে দরখাস্ত করি তোর নামে,—তোর দশাটা একবার কি হয় তা ভেবে দেখেছিস? দিন-দিন বেগুনি ভাজা কি বল্ দেখি,—ছেলে-কাঁদানে দিন-দিন?"

বেচু জাতিতে ময়রা, দোকান করিয়া খায়, মানুষের মন ভুলাইতে জানে। অতি সত্বর হাতের ঝাঁঝরাটি বেগুনির ঝুড়ির উপর রাখিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল, তাহার পর নিজের বসিবার চট্‌খানা বাঁহাতে সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, "বসুন, পাঁড়ে-মহাশয় বসুন।"

"না, আর বসব না। কিন্তু এই বলে' রাখছি বেচা, বেগ্‌নি-টেগ্‌নি আর করিস না। আমরা জাত কনুজ্যে, আমাদের রাগ ভারি খারাপ।"—বলিয়া গণেশ চালার উপর চট্‌খানা টানিয়া লইয়া চাপিয়া বসিল। ভ্যাঁট্‌র রাস্তর উপর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বলিল "বস্ বেটা, বোস্ ওই খানে। কাঁদিস্ না—বলছি, কাঁদিস্ না, কাঁদবি ত' দেব এখুনি টুঁটি টিপে' মেরে।"—এই বলিয়া সে দন্ত

ও হস্তের দ্বারা টুঁটি চাপিবার ইঙ্গিতটা তাহার ক্রন্দনরত পুত্রকে একবার দেখাইয়া দিল।

বেচু তাহার ডালি হইতে দুইটি মোটামোটা বেগুনি তুলিয়া ভ্যাট্‌রার হাতে দিয়া বলিল, "খান্ পাঁড়ে-মহাশয়, ততক্ষণ সেবা দিন্—তারপর এই আর-এক ঝাঁক নামিয়েই—"

পুনরায় সে গরম তেলের উপর বেগুনি ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল, "তবে শুনুন্ পাঁড়ে-ঠাকুর, শুনুন! খড় বলতে ত' এক আঁটিও নাই আর এ-গাঁয়ে কারও। চড়া দাম পেয়ে ত' সবই হুঁ হুঁ। তাই বলি ত' গরু-বাছুরগুলো তাহ'লে খায় কি? সেইজন্যেই বলি কিনা—দু'চারটে বেগ্‌নি ফুলুরি ভেজে রাখি—বাউরি-বাগদি ছোটলোকগুলো সব দু'চার বোঝা করে ঘাস দিয়ে যাবে, আর এই মদের সঙ্গে খাবার জন্যে দু-এক পয়সার তেলে-ভাজা—এই আর কি! বোয়েছেন কিনা পাঁড়ে ঠাকুর দিন্ আপনার পায়ের ধূলো দিন চারটি।"—বলিয়া হাত বাড়াইয়া পাঁড়েঠাকুরের ধূলি-সমাচ্ছন্ন পদতল দুইটি স্পর্শ করিয়া বেচু তাহার মাথায় ঠেকাইল।

কাশী হাজরার কলিকায় আগুন দেওয়া তখন শেষ হইয়াছে, দেওয়ালে-টাঙানো ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কড়ি-বাঁধা হুঁকাটি পাড়িয়া আনিয়া সে তখন পড়্ পড়্ করিয়া তামাক টানিতে টানিতে একেবারে হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছিল; অবশেষে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "সেদিনের সেই মোকদ্দমাটার কি হলো পাঁড়ে?"

পাঁড়ে বলিল, "কোন্‌টা? কোন্ মোকদ্দমার কথা বল্‌ছিস? একটি মোকদ্দমা ত' নেই আমার হাতে যে ঝপ্ করে' বলে ফেল্‌ব—কি হলো। সেই কাঙ্গাল সেখের দাঙ্গার মোকদ্দমা?"

"হাঁ হাঁ, সেই কাঙাল সেখ—।"—বলিয়া কাশী হাজরা আবার তাহার হুঁকায় দম দিতে লাগিল।

পাঁড়ে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এই গণেশ পাঁড়ে যে-তরপে দাঁড়ায়, সে তরপের কি আর হার আছে রে কখনও বেকুব? কাঙাল জিতলো। দাঙ্গায় দুটো মাথাও ফাটালে, আবার ডিগ্রিও পেলে। ওরে ওসব অনেক কাণ্ড। মামলা-মোকদ্দমা কি আর সহজ জিনিষ রে বাবা।"

কড়াই হইতে বেগুনি তুলিতে তুলিতে বেচু বলিল, "মাথা চাই, বোয়েছেন-কিনা হাজরা-ঠাকুর, ও-সবের এক আলাদা মাথা।"

কাশী হাজরা বলিল, "তা বটে বাপু! মোকদ্দমার নাম শুন্‌লে আমাদের মাথা ঘোরে, আর সেদিন সেই বলরাম মোড়লের জানি-চিনি দিতে গিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম কিনা, পাঁড়ের ভয়ে আদালত-সুদ্যো কাঁপছে-উকিল-মুক্তিয়ার ত' বাপ্-বাপ্ ডাক ছাড়ে—।"

বেচু বলিল, "ও ই, সে-কথা কি-আর বল্‌তে! আর—মামলা-মোকদ্দমার কথা আর বলো না হাজ্‌রা, সে-বছর সেই ভাইপো করলে মাম্‌লা আমার নামে। আমি বলি আদালতে যাব না বরং সেই ভাল—একতরুপা ডিগ্রিই হোক্। গেলাম না। তা বাপু তুমি যাই বল, এই আদালত-ফাদালত করে' কোন রকমে শাশিত্ করে' রেখেছে এই দেশটাকে—না কি বল পাঁড়ে?"

পাঁড়ে থিক্ থিক্ করিয়া খানিক্‌টা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "শাশিত্ না আমার ইয়ে করেছে বেচু। আইনের ফাঁকি বাবা সব—আইনের ফাঁকি, আর মার্-প্যাচ্। বল্—কোন্ শালার মাথা ফাটাতে হবে এ-গাঁয়ে বল্—আমি দিচ্ছি চ্যালা কাঠ্ দিয়ে দুফাঁক্ করে' তোর সাক্ষাতেই। দেখি তাপরে কি হয়,—ফুস্ আর ফাস্! এই গোঁফ জোড়া—দেখেছিস্ কিনা—" —বলিয়া পাঁড়ে তাহার গোঁফে হাত দিয়া আবার বলিল, "এই গোঁফ্—মা-বাপের ছাদ্ধের সময় ফেলিনি এই গোঁফ—মাথা কামিয়েছিলাম, দাড়ি কামিয়েছিলাম, কিন্তু এই গোঁফ্ কামাইনি বাবা! মরদ্—মরদ্ চাইরে বেচু, মরদ চাই! মরদ্ কোন্ শালা আছে এই গাঁয়ে—মরদ্? এ-কথা ত হাঁক্ মেরে বলছি আমি,—কই, কোন্ শালা আস্‌ছে—আসুক্।"

"এই যে পাঁড়ে!"

বলরাম মিস্ত্রি সেই পথ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, পাঁড়েকে দেখিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মিস্ত্রি বলিল, "গাঁয়ে এক ভারি মজার ব্যাপার ঘটে গেছে।"

উপস্থিত সকলেই তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

"কি ব্যাপার—?"

মিস্ত্রি বলিল, "একজন ডিমওয়ালা পেরিয়ে যাচ্ছিল সজনী দত্তর দরজা দিয়ে—"

"তারপর?"

"এক ঝুড়ি মুরগীর ডিম নিয়ে যাচ্ছিল ইষ্টিশানে।"

কাশী হাজরা বলিল, "হুঁ। যায় বটে; দেখেছি। তারপর?"

মিস্ত্রি বলিল, "তারপর আর-কি, নিয়েছে ক'জন ছোকরা মিলে' কিছু আদায় করে'। আমাদের বেনোয়ারী ওস্তাদের দলটি ছিল, আর ছিলেন আমাদের কেনারাম মুখুজ্যে—"

বেচু ময়রা, মিস্ত্রিকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, গণেশ পাঁড়ে তাহাকে চুপ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত আন্দাজ হবে?"

"তা—লোকটা ত ভয়ে-ভয়ে বলছে এখন পাঁচসিকে, কিন্তু পাঁচসিকে ত' আমার বিশ্বেস হয় না—আরও কিছু বেশিই হবে।"

গণেশ পাঁড়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মার্-ধোর্?"

"তা কিছু হয়েছে বই-কি! আপনি নিজেই জিজ্ঞেস্ করুন্-গে না একটু উঠে' গিয়ে। হাল্-হকিগৎ সবই টের পাবেন।"

পাঁড়ে বলিল, "কোথায়—কোথা গেল সে লোকটা?"

মিস্ত্রি বলিল, "আপনার ঘরেই ত' দিলাম পাঠিয়ে, তবে আর বলছি কেন ঠাকুর। রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল, আমি বলি ত' আপনি হয়ত ঘরেই আছেন, তাই বল্লাম বলি, যা তবে, এর পিতিবিধেন্ যদি-কিছু হয়, তো ওই পভুর কাছেই হবে।"

"তাই নাকি? তবে ত' উঠ্‌তে হয়!"

গণেশ পাঁড়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাড়াতাড়ি শালপাতার একটা ঠোঙা তৈরী করিয়া কয়েকটি বেগুনি-সমেত ঠোঙাটি ভাঁট্‌রার হাতে দিয়া বেচু বলিল, "যাও, সেবা দাওগে। পেনাম্। কিন্তু বোয়েছেন কিনা পাঁড়ে-ঠাকুর, বেগুন আনলাম ইষ্টিশানের হাট থেকে। চার-আনা সের। বলি, আচ্ছা তাই তা-ই। আমাদের এই ধরম্-তলার হাটে ত' আর উ-কম্ম নাস্তি। আচ্ছা করেছেন আপনি সেদিন সেই চাষাকে ঠেঙিয়ে। বেটারা ভারি বজ্জাত।"

কাশী হাজরা বলিল, "আচ্ছা বেগুন বাবু সেদিনের। কিন্তু গোলমালে তিনটির বেশি আর পাওয়া গেল না।"

বলরাম মিস্ত্রি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু আঁচল-ভর্ত্তি নিয়ে গেছলাম দাদা, তা তোমরা যা-ই বল আর তাই বল। পাঁড়ের দৌলতে চারটি দিন পুরো দুবেলা,—বেগুন পোড়া, বেগুন ভাজা, বেগুনের তরকারি, বেগুনের চড়চড়ি, মায় বেগুনের অম্বল।"

গণেশ পাঁড়ে থামিল। বলিল, "দেখ্‌লে ত' সেদিন বেচু, বেটা আমার কী উল্টিয়ে নিলে? বলে-কিনা যুদ্ধুর বাজার। যুদ্ধুর বাজার ত' তোর বেগুনে যুদ্ধু কিসের রে হারামজাদা! দিলাম ঘা-কতক বসিয়ে। অন্যায় সহ্য হবে কেন? আমরা জাত-কমুজ্যে। আমাদের রাগ ভারী খারাপ।—ওরে ও ভাঁট্‌রা, নিজেই যে সব মেরে দিলিরে হারামজাদা,—রাখ্ তোর মায়ের জন্যে রাখ্ দুটো,—কই দেখি।"—বলিয়া ঠোঙা হইতে একটি বেগুনি তুলিয়া মুখে পুরিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে গণেশ পাঁড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

বলরাম মিস্ত্রি এইবার ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। কাশী হাজরার তামাক খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। কলিকাটির জন্য হাত বাড়াইয়া মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করিল,

"আচ্ছা হাজরা-ঠাকুর, যুদ্ধু-যুদ্ধু ত' খুব শুন্‌ছি আজকাল, কিন্তু যুদ্ধুটা ঠিক কোন্‌খানে হচ্ছে ?"

ইউরোপে তখন যুদ্ধ বাধিয়াছে। বিংশ-শতাব্দীর মহাযুদ্ধ।

হাজরা-ঠাকুর হুঁকায় শেষ-টান টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবে কহিল, "বিলেত,—বিলেত।"

বেচু আবার তাহার বেগুনি ভাজার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হাজরা-মশায়, বোয়েছেন কিনা, বিলেতটা আমাদের এই দেশের কোন্‌বাগে ?"

কাশী হাজরা হুঁকা হইতে গরম কলিকাটা ধীরে-ধীরে বলরাম মিস্ত্রির হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল,—"পূব—ঠিক একেবারে খারা পূব্।"—তারপর একটুখানি থামিয়া বলিল, "সেদিন সেই আদালতে গেছলাম। ফিরতে রাত হলো। উড়ো-জাহাদ্ দেখে এলাম সেদিন।"

মিস্ত্রি কলিকা টানিতে টানিতে বলিয়া উঠিল, "সে আবার কিরকম আজ্ঞে ?"

সুমুখের মাঠে বেচুর গরুর গাড়ীটা পড়িয়া ছিল, হাজরা বলিল. "ওই গাড়াটার তে-ডব্বল হবে, জন পঁচিশ-ত্রিশেক লোক অনায়াসে চড়তে পারে। তারপর পা—ই করে' আকাশে উড়ে চলে' যায়।—ডাঙ্গায় পড়লেই হাওয়া-গাড়ী, আবার জলে পড়লেই জাহাদ্।"

"তাহ'লে ত' সে এক তাজ্জুব ব্যাপার বোয়েছ কি-না !"

কড়াই-এর বেগুনিগুলা পুড়িয়া যাইতেছিল, বেচু তাড়াতাড়ি সেগুলিকে কড়াই হইতে নামাইয়া বলরাম মিস্ত্রির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "ঠুক্-ঠাক্ করে' শুধু কাঠের গাড়ী তৈরী করা নয় মিস্ত্রি বোয়েছ কিনা, এমনি এক-আধটা—"

কাশী হাজরা গম্ভীরভাবে কহিল, "আজ তোমাদের দেখাব। রোজ ওঠে।"

সেদিন রাত্রে আকাশের সন্ধ্যা-তারাটিকে কেহ আর তারাই বলিল না……

কাশী হাজরা বুঝাইয়া দিল, "অনেক দূরে রয়েছে বলে' আমরা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না, কিন্তু ওটা চল্‌ছে,—ঘণ্টায় তিন-চার কোশ ত' খুব।"

বলরাম মিস্ত্রি তাহার কপালে হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উর্দ্ধে আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "হুঁ নড়্‌ছে। দেখ তোমরা বাঁ-চোখটা বুজে,—এইদিকে একটুখানি কাৎ হয়ে—।"

অনেকেই দেখিল।

সেইদিন হইতে বেচারাম ময়রা কিছু কিছু বুঝিতেছিল মনে হইতেছিল যেন তাহার চোখ ফুটিয়াছে।

মাঝে মাঝে সে তাহার স্ত্রীকে উঠানের উপর টানিয়া আনে। মাথাটা উপরের দিকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলে,—"উ—ই দেখ—"

স্ত্রী বলে, "দেখলাম।"

বেচারাম বলে, "আর এই দেখ্, বোয়েচিস্-কিনা, এই কদম-গাছটার দিকে তাকা, এই দিকটা পুব-দিক, এই দিকে সূয্যি ওঠে ;—আর ও-ই যে দেখচিস্ অনেক-গুলো গাছ, ওর ও-পারেই তোর ভাবির শ্বশুরঘর,—তার ওপারে, তার ও-পারে, অনে—ক দূর-সেইখানে বিলেত—।"

আরও বুঝাইবার চেষ্টা করে।—পৃথিবীটা অনেক বড়। ……এবং সেখানে বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহও হয়।

ক্রমশ

নাগার্জ্জুন

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জানি তব কক্ষে আছে দুঃখের অনল-উৎস, শ্যাম-শষ্প-বলয়িত সুখ-নির্ঝরিণী,
হে পৃথিবী মানব-মোহিনী !
প্রসারিত করপুটে ধরে' আছ জীবনের বিচিত্র যৌতুক—
রূপসীর মুখ-মধু, শরতের শতদল, লেলিহান চিতার কৌতুক !
আর বজ্র,—জ্বলে' ওঠে আচম্বিতে অগ্নিবিম্ব যাহে,
অদৃষ্টের অন্ধকার আকাশ-কটাহে !
তবু সে সকলই ফাঁকি !—সর্ব্বজ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিধি
ঘুরিয়াছে এই মোর তৃপ্তিহীন হৃদি !
সিন্ধু-সরীসৃপ সম লালায়িত বাসনার যত অনীকিনী
বাজায় মানব চিত্তে ভেরী-তূরী, বেণু-বীণা, কনক-কিঙ্কিণী—
তারা যে গো দেখা দেয় সারি সারি ছায়াময়ী কুহকিনী প্রায়
প্রিয়ার সে আঁখি-দীপে !—মুহুর্মুহুঃ তারা মুরছায় !
আরও এক আছে নারী—বঙ্কিম গ্রীবায় তার, কটিতটে, নগ্ন বাহুমূলে,
শঙ্কিত সঙ্কেত সম দুটি তার বুকের বর্ত্তুলে,
আঁকা আছে এ বিশ্বের যত আশা যত সে দুরাশা—
রূপে-লেখা অরূপের ভাষা !
একজন দেয় পাড়ি কত যুগ-যুগান্তের নীল পীত যবনিকা দ্রুত অপসারি'—
স্বপনের তুরঙ্গম—ভর করি' পাখায় তাহারি !
আর জনা—হেমন্তের সদ্যছিন্ন নীবার-মঞ্জরী—
তারি মত দেহগন্ধে শয্যাতল রাখিয়াছে ভরি' !
এর চেয়ে কিবা সুখ ?—মধুর কষায় কোন্ পানপাত্রখানি
ধরিবে আমার ওষ্ঠে হে ধরিত্রীরাণী ?—
আমি যে বেসেছি ভালো দুই জনে, সমান দোঁহারে—
বালাবধূ যশোধরা, বারাঙ্গনা বসন্তসেনারে !

ত্বরিতে উঠিয়া গেনু মন্ত্রবলে স্বরগের আলোক-তোরণে,
—প্রবেশিনু অকম্পিত নিঃশঙ্ক-চরণে।
অমর-মিথুন যত মুরছিল মহাভয়ে—শ্লথ হ'ল প্রিয়-আলিঙ্গন,
কহিলাম, "ওগো দেব, ওগো দেবীগণ।

আমি সিদ্ধ নাগার্জ্জুন, জীবনের বীণাযন্ত্রে সকল মূর্চ্ছনা
হানিয়াছি, এবে তাই আসিয়াছি করিতে অর্চ্চনা
তোমাদের রতিরাগ ; দাও মোরে, দাও ত্বরা করি'
কামদুঘা সুরভির দুগ্ধধারা এই মোর করপাত্র ভরি' !"
—মানবী-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান
অমৃত-পায়স তার মনে হ'ল ক্ষার কটু প্রলেহ সমান !
জগৎ-ঈশ্বরে ডাকি কহিলাম, "ওগো ভগবান !
কি করিব হেথা আমি ?—তুমি থাক তোমার ভবনে,
আমি যাই ; যদি কভু বসিতাম তব সিংহাসনে,
সকল ঐশ্বর্য্য মোর লীলাইয়া নিতাম খেলা'য়ে—
বাঁকায়ে বিদ্যুৎ-ধনু, নভো-নাভি পূর্ব্বমুখে হেলায় হেলা'য়ে
গড়িতাম ইচ্ছাসুখে নব নব লোক-লোকান্তর !
—তবু আমি চাহি না সে, তব রাজ্যে থাক তুমি চির-একেশ্বর।
মোর ক্ষুধা মিটিয়াছে ; শশী সূর্য্য তোমার কন্দুক ?
আমারও খেলনা আছে—প্রেয়সীর সুচারু চুচুক !
স্তোত্র-স্তুতি ভোগ্য তব, তবু কহ শুধাই তোমারে—
কভু কি বেসেছ ভালো মুদিতাক্ষী যশোধরা—মদিরাক্ষী বসন্তসেনারে ?"

এত বলি' নামিলাম বহুনিম্নে, অতিদূর নরক গভীরে—
তপ্তস্রোতা বৈতরণী-নীরে।
লাল নীল অগ্নিশিখা, প্রধূমিত বারিরাশি হয়ে গেনু পার,
উত্তরিনু বক্ষরক্ত-হিম-করা যেথা সেই মসীবর্ণ জমাট তুষার !—
বিশাল মণ্ডপে তার বার দেয় একা বসি' মার মহাবল,
হেরিনু তাহার সেই পাদপীঠতল
স্কন্ধে তুলি' কাঁদিতেছে প্রেত সারে সারে !—
মানবের মৃত-আশা আঁকা সেথা কক্ষতলে ভস্মরেখাকারে !
শত শত রক্তরশ্মি দীপবর্ত্তিকায়
ক্ষরিছে শোণিতবিন্দু দীর্ঘশ্বাস-স্ফুরিত শিখায় !
ভালো যারা বাসিয়াছে, যুগে যুগে যাপিয়াছে নিদ্রাহীন নিশা,
যারা চির-জরাতুর বহিয়াছে সারাদেহে আমরণ নিদারুণ তৃষা—
তাদেরই সে প্রাণবহ্নি জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ মারের লোচনে !
অগ্রসরি কহিলাম বিনম্রবচনে,
"হে বন্ধু নরকনাথ ! বিধির দোসর !

তোমার ব্যথার কাঁটা বিঁধিয়াছে আমারও পঞ্জর—
শত বিষ-বৃশ্চিকের মালা
পরিয়াছি কণ্ঠে মোর, সহিয়াছি তোমা সম কোটিকুম্ভ নরকের জ্বালা!
আমি যে বেসেছি ভালো দুইজনে সমান দোঁহারে—
শুভ্রযূথী যশোধরা, নিশিপদ্ম বসন্তসেনারে!"

ক্ষুদ্র দেব-দেবতায় তেয়াগিয়া এইবার মহাশূন্যে করিনু প্রয়াণ,
ভেটিলাম মহাকালে,—কহিলাম নতশিরে বিষণ্ণ-বয়ান,
কামের পূজারী আমি, হে মহেশ! দেহযন্ত্রে করিয়াছি নাড়ীচক্রভেদ,
হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করি' শিখিয়াছি সুধাবিষ-মন্থনের মহা-আয়ুর্ব্বেদ!
ধরার দুলালী যারা—দুইরূপে দুলায়েছে হৃদয় হিন্দোলা—
পল্লীবালা সরোজিনী, আর সেই পুষ্পসেনী সুনীল-নিচোলা!
দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে তাই হারায়েছি পথ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে কোনখানে পূরে নাই মোর মনোরথ।
দাও বর—ডুবে যাই বিস্মৃতির অতল-পাথারে,
অথবা নূতন করি' গড়ি' দাও এই মোর পুরাতন প্রাণের আধারে—
দাও তারে হেন আবরণ,
সব হবে মনোময়—নাহি রবে স্নায়ু-শিরা-শোণিতের মর্ম্ম-শিহরণ,
হলাহল হবে সুধা, সত্য হবে মিথ্যারই স্বরূপ।
আর সেই পৃথ্বীসুতা—আঁধারের উদূখলে দলি' তার দুই-দেহ-রূপ,
সেই চূর্ণ তেজমুষ্টি মিলাইয়া এক নারী করগো নির্ম্মাণ—
আনন্দ-সুন্দর তনু, স্বপনের অতিথিনী, কামনার পূর্ণ প্রতিমান!
ধন্য হব সেইদিন, একরূপে ভুঞ্জিব দোঁহারে—
কুলবধূ যশোধরা, বারবধূ বসন্তসেনারে!"

মার্কিন কবি George Sylvester Viereck-এর অনুভাবে

বেনামি বন্দর

দিদিমণি

লেখ্-রাজ সামন্ত

হোটেল ঠিক নয়।

দিদিমণি রাঁধে—এগার জনের ভাত-রুটি, রোজ ত্ববেলা।

বলে, "ভাই, হ্যাঙ্গাম্ অনেক।—নিমে আর বড়িতে শাকে আর বেগুনে, এই ত' আমার কাজ।"

বলেই হাসে।

আবার হেসেই বলে, "লাভের ত' সীমে নেই! মাথা-পিছু পাই ত' মোট্ বারো। তাও আবার কেলো নোনা পালিয়ে গেল,—সীপতি গেল মরে'।"

ছোট্ট ঘরখানির এক কোণের দিকে -মাটি-লেপা তোলা একটি উনোনে দিদির রান্না চলে। উনোন থেকে কড়াইটা নামিয়ে দিদি বলে, "মার্ ঝেঁটা! মার ঝেঁটা! হাটের ফিরিঙ্গি সব! ফাঁকি দিতে ঘেন্না করে না? পেটের ভাত—খেলি ত' ত্ববেলা গণ্ডে-পিণ্ডে! পুরুষের মুয়ে মারি সাত ঝাঁটা।"

মুখ তুলে চেয়ে দেখি।

দিদির বড় বড় চোখত্বটি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, "তোমায় বলিনি ভাই, বলছি ওই মুখপোড়াদের—!"

'মুখপোড়ারা আসে। যতীন, শ্রীমন্ত, বিষ্ণু, নলিন……

গলি-রাস্তার পাশে সদর-দরজাটি বন্ধই থাকে, দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুক্তে হয়।

নলিন ঘরে ঢুকে তার ছেঁড়া চটিজোড়াটি চৌকাঠের পাশে খুলে রেখে বলে, "হ্যাঁ, বন্ধ করেই রেখো দিদি,—দরজা খুলে কখ্খনো রেখো না।"

পান-রাঙা পাৎলা ত্বটি দিদির ঠোঁটের ওপর হাসির আভাস ফুটে ওঠে; মুখ তুলে বলে, "কেন্‌রে মুখপোড়া, তোর ভয়ে নাকি?"

"তা না ত' কী?"

হাসতে হাসতে নলিন বাঁহাত দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। বলে, "বামুনের ছেলে—খাই কায়েতের হাতে এই ঢের, পথের লোকে দেখে কেন?"

দিদি রেগে ওঠে, "কেন্ রে মুখপোড়া বামুনের ছেলে? আমি হাড়ি না মুচি? খাবি খাবি, না খাবি না খাবি।"

দিদির মুখ খুলে যায়। তার জীবনেব কাহিনী আগাগোড়া বলতে সুরু করে।

"বিধবা হই কোলের ছেলেটাকে নিয়ে—। সেই ছেলে আজ কুড়ি বছরের মরদ জোয়ান্। ভাইরা দিলে না ভাত—বলে, নচ্ছার, ছিনেল্। বেশ, তাই তাই। মাথার ওপর ভগমান আছেন—।"

দিদি একবার মাথার ওপরে কালি-মাখা কড়িকাঠ-গুলোর দিকে তাকায়। বলে,

"খেতে দিবিনে? আমিও ভাই পাকা মেয়ে। গতর আছে, সেই অব্ধি খেটে খাই। সেই-যে কথায় আছে,—ভাত দেয় কি ভাতারে, ভাত দেয় আমার গতরে।"

কথাটা বলেই দিদি একবার সলজ্জ হাসি হাসে।

বলে, "এই তোমাদের শদজনকে খাওয়াই—নিজেও খাই। খাই ত' ভারি! বিধবা মানুষ,—আজ খাই আবার কাল খাই। তাও ত' দেখেছ আতপ্-চালের ভাত, আর ত্বটো আলু-ভাতে। এমন শুদ্ধু-শান্ত হ'য়ে—কে থাকে রে মুখপোড়া, কে থাকে শুনি?"

নলিন কলার পাতাটা ধুয়ে নিয়ে পিঁড়ির ওপর চেপে

বসো। বলে, "আচ্ছা তাই হলো না হয়, দাও—ভাত চারটি বেশি করেই দিও আজ—।"

দিদি তার পাতার ওপর ভাত ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে হাসে। বলে, "অনেক দেখলুম রথ-রথী, শেষকালে সেই চকরবর্তী! সেই দিদিমণি ছাড়া উপায় নেই বাবা! – ওই যে হারাণ গিয়েছিল দিন-কতক্‌, কালীঘাটের সেই বাম্‌নী—বল না হারাণ, ছুঁড়ীর সেই কীত্তিব কথাটা একবার শুনিয়েই দাও না!"

ঘরের এককোণে দিদিমণির তক্তাপোষের ওপর হারাণ চুপ করে' বসেছিল। কপালেব ওপরে প্রকাণ্ড একটা টাক্‌, চোখে নিকেলের পুরু চশমা, ঘন গোঁফ-জোড়ার ভিতর ঠোঁট দুটো বেমালুম ঢাকা পড়েছে। হাতের জলন্ত বিড়িটা দেওয়ালের গায়ে টিপে নিবিয়ে সে একবার আমার মুখের পানে তাকিয়েই বল্‌তে সুরু করলে,

"আজ তের বচ্ছর ধ'রে এইখানে থাচ্ছি, বুঝলেন? এটা ঠিক হোটেল ত' নয়—হোটেল একে বলা চলে না। বাড়া! বাড়া! এই ধরুন, একমাস আমার চাকরিতে জব.ব হয়েচে—তা কই - "

দিদি তাকে এক ধমক্‌ দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। "আ মর্‌! ধান ভান্‌তে শীবের গীত! সেই বাম্‌নীর কথা বলছি, কালীঘাটের সেই বামনী—"

চোখ বুজে একটা ঢোক্‌ গিলে হারাণ কালীঘাটের সেই বাম্‌নীর কথাই বলতে যাচ্ছিল, দিদিমণি তাকে আর বলবার অবসর দিলে না। বল্‌লে, "মাগীকে সেদিন দেখেই আমি ঠিক ধরেছি। ডাকিনীর মতন চোখ, ভাই, বুঝলে? গায়ে এক-গা গয়না। হোটেল ত' আমিও করি! গয়না রয়েছে, বলে, ভাত কাপড় জোটে না। এই দেখ না ভাই—এ—এই দেখ!" হাঁটুর নীচে কাপড়ের খানিকটা ছেঁড়া দেখিয়ে দিয়ে দিদি বল্‌লে, "সে মাগীর আবার একটি বাবু আছে—এই বুড়ো বয়েসে। মিন্‌ষেকে যদি একবার দেখ্‌তে তুমি ভাই—"

বলেই দিদি হেসে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

"এম্‌নি বড় বড় চুল, এম্‌নি দাড়ি, এমনি গোঁফ্‌! গেরুয়া রং-এর কাপড়, আর এম্‌নি ভুঁড়ি!—কালীঘাটে শেতলা-ঠাকুরের পুজো করে আবার! দেখে-শুনে' আর ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বেস টিশ্বেস্‌ হয় না ভাই আমার!"

"নাঃ! আমারও হয় না। এই ত' একটি মাস চাক্‌রি গেছে, রোজ দুবেলা—দেখছ ত' স্বচক্ষে—।"

হারাণ আরও কি-যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথাটা এবারেও দিদি তাকে শেষ করতে দিলে না। বল্‌লে, সেই বাম্‌নীর হোটেলটা নলেকে তুমি একবার দেখিয়ে দিও হারাণ, কাল থেকে ও ওইখানেই খাবে,—জাত-জন্ম সবই থাকবে ওর।"

নলিনের খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বললে, "দাও, অম্বল দাও দিদি, পাশ্চিত্তি করেই না হয় বাড়ি যাওয়া যাবে। কিন্তু মাথা-পিছু বারোটা করে' টাকা দিদি, এক-একজনের খেতে আর কত খরচ হয় মাসে?—খুব জোর না হয় সাত টাকা করেই ধরলাম।"

"তাই একবার করেই দেখ্‌ না হতভাগা!"

"নাঃ! নেহাৎ তোমার ভাত মেরে দেওয়া হয়—।"

নলিন হাসতে হাসতে উঠে গেল।

জিব দিয়ে মুখে একরকম শব্দ করে' দিদি বল্‌লে, "মোজার কল থেকে কাল আবার দুজন নতুন লোক ভর্ত্তি হয়েছে এখানে। তারা যে আবার কখন আসবে তার নাইকো ঠিক্‌। বসে' থাকি ভাত বেড়ে'—কি আর করি বল?"

বল্‌তে বল্‌তেই দরজা ঠেলে মোজার কলের একটি লোক ঘরে ঢুকলো। যেমন লম্বা, তেমনি পাৎলা; সম্প্রতি কি একটা ব্যারাম থেকে উঠে মাথার চুলগুলো সব ন্যাড়া হয়ে গেছে, গালের উপর খানিকটা তুলো দিয়ে ময়লা ন্যাকড়ার একটা 'ব্যাণ্ডেজ্‌' বাঁধা। লোকটি ঘরে ঢুকতেই আইডোফর্ম্মের বিশ্রী গন্ধে ঘরটা একেবারে ভরে' গেল।

হারাণ বল্‌লে, অনেকদিন বাঁচবেন আপনি—এইমাত্র আপনার নাম হচ্ছিল।

পুরনো একখানি ছেঁড়া বস্তা অতিযত্নে পেতে দিয়ে দিদি বললে, "বসো। তোমাদের আর-একজন?"

জবাব দিতে গিয়ে কথাটা তার মুখেই আট্‌কে গেল, দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্যাচ্‌ করে' খানিকটা থুতু ফেলে বল্‌লে, "মুখ দিয়ে খালি পুঁজ আর রক্ত উঠ্‌ছে। আসবে—সে গেছে সুতোপটি।"

আঁচিয়ে এসে জুতো পায়ে দিতে গিয়ে দেখি, ভদ্র-লোকের মুখের পুঁজ' আর রক্ত আমার জুতোর উপরেই এসে পড়েছে।

"করেছেন কি মশাই ?"

বল্‌তেই ভদ্রলোক ভাতের ঢেলাটা কোঁৎ করে গিলে ফেলে আমায় হাতের ইসারা করলে।

"—একটু দাঁড়ান! খেয়ে উঠেই ধুয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু তাকে আর কষ্ট করে, ধুতে হলো না, জুতো জোড়াটা দিদিমণি তৎক্ষণাৎ হাতে করে, তুলে নিলে। হেঁসেলের পাশেই দেওয়ালের গায়ে জলের কল;—দিদি নাকি সেটা নিজের খরচেই করে, নিয়েছে! হোক্ না ভাড়ার বাড়ি,—হাতের কাছে সুবিধা কত! বাঁহাত দিয়ে কলের মুখটা খুলে' দিয়ে দিদি হাসতে লাগল; জুতোদুটো কলের নীচে বসিয়ে দিয়ে বললে, "হলো ত ?"

কলের জল পুঁজরক্ত সমেত ছিট্‌কে গিয়ে হেঁসেলে লাগছিল। বল্‌লুম, "করছ কি দিদি হেঁসেল সামলাও।"

"কিচ্ছু হবে না।"

দিদি হেসেই উড়িয়ে দিলে।

কলের জল দিদির নিষেধ শুনবে কেন? লাগল বৈকি!

দিদি বল্‌লে, "অতসব ঘেন্না-ঘেন্না নেই ভাই আমার। সীপতির বসন্ত হলো—ওই-যে ওই হারাণ যেখানে বসে' রয়েছে ওই বিছানায়। আর-বচ্ছর এমনি দিনে না কি বল হারাণ ?"

ঝিমোতে ঝিমোতে হারাণ সোজা হয়ে উঠে বসলো।

"এই ধরুন না, অক্টোবর মাসে আমার চাকরি গেছে তাহ'লেই হলো-গিয়ে সেপ্টেম্বর—"

গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে হারাণ তার ডানহাত খানি বার করলে। আঙুলের পাব্‌ গুণে হিসেব করে' বলে' সে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু দিদির আর সবুর সইল না, বল্‌লে, "হাঁ ওই সেপ্‌টাম্‌পার্‌ না কি বলছ ওই মাসেই। গু-মুৎ উলোলাম এই দুটি হাত দিয়েই। বসন্তের গুটি, পচে' গন্ধ হয়ে গেল। চাকরি করতো, ঘর যেতে পেলে না বেচারি! চারটি দিন হোটেল বন্ধ। কেউ খেতে এলো না ভাই! মরলো সেই দু'ফর্‌ রেতে, চারদিক থম্‌ থম্‌ করছে—অন্ধকার; বাবুলাল দোকান বন্ধ করে চলে গেছে,—আমি, আর সেই পচা গন্ধ-ওঠা মড়া; এই ঘরে—একা। মরবার আগে দুটি কথা বলেছিল ভাই—'দিদি, আমি মরতে চাই না দিদি—বাঁচাও আমাকে।'

চোখ দিয়ে দিদির দর্‌ দর্‌ করে' জল গড়িয়ে এল।

ভিজে জুতোদুটো পায়ে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছিলাম, সেই ঘরেরই দোতলার একটা ভাঙা ঝুলে-পড়া জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে খোকাবাবু ডাকলে, "ও মশাই, আপনার নামটি কি ভুলে যাচ্ছি - শুনুন্‌!"

মুখ তুলে ফিরে দাঁড়ালাম।

খোকাবাবুর বয়স আন্দাজ চল্লিশ হবে, মাথার চুল-গুলো ঝাঁপিয়ে মুখের ওপর এসে পড়েছে, নীচের পাটির সুমুখের দুটি দাঁত ভেঙে গেছে। বলে, "ব্যেরাধি হয়েছিল মশাই, কাঁচা পারা খেয়েছিলাম, কম-বয়সে তাই এই দাঁতের দুর্দ্দশা। আমার কাছে ঢাক্‌-ঢাক্‌ গুড়-গুড় কিছু নেই দাদা, মিছে কথার ওপর আমি ভারি চটা।"

যেতে হলো। দিদিমণির ঘরের পাশ দিয়ে অন্ধকার একটা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে' গিয়ে দেখি, সিঁড়ির মাথায় খোকাবাবু দাঁড়িয়ে আছে, পরণের কাপড়টা লুঙ্গির মত করে' পরা হয়েছে,—গায়ে একটি রঙিন ডোরাকাটা ময়লা ফতুয়া।

বললে, "ওদিকটায় যাবেন না, ভাড়া দেওয়া হয়েছে, —এই দিকে আসুন।"

একখানা ঘরের আধখানা জুড়ে' একটি তক্তাপোষের ওপর পুরু বিছানা পাতা, চারটা দেওয়াল জুড়ে বিস্তর রং বেরংএর ছবি টাঙানো; আসবাবপত্রের ত্রুটি নেই, কাঠের একটা চৌকির ওপর পিতল-কাঁসার কয়েকটি

বাসনের পাশে একজোড়া ডুগি-তবলা দেখলাম সযত্নে সাজানো রয়েছে।

খোকাবাবু বললে, "বসুন। এই ঘরে আমার পিতৃদেব আত্মহত্যা করেছিলেন, এটি আমার ভারি প্রিয়ো। হেরো! হেরো—! ও হেরো—! দেখুন এরই মধ্যে পালালো হারামজাদা।"

দশ পনের বার ওই নাম ধরে ডাকাডাকির পর—হেরো এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

ছোকরাটিকে দিদিমণির ঘরে অনেকদিন দেখেছি। নাম হারাধন।

"এই যে!" বলে' খোকাবাবু আমার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বলুন ত' মশাই,—কাল আপনি যখন খেতে বসেছিলেন, তখন হেরোকে আমি ডেকেছিলাম কিনা? খুঁজ্‌তে গিয়েছিলাম কিনা দিদির ঘরে?"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? কি হয়েছে কি তার?"

"আ হীহীহী, ওই জন্যেই ত' ডাকা হয়েছে মশাই আপনাকে! তবে আর বলছি কেন? ও বলে, না তুমি ডাকনি কাকা! মিছে কথার ওপর আমি ভারি চটা, ঢাক্-ঢাক্-গুড়্-গুড়্ নেই আমার কাছে। বলুন,—ডেকেছিলাম কিনা?"

হারাধন চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসে পড়লো, বললে, "আমি এখনও বল্‌ছি—তুমি ডাকনি।"

"ডাকিনি? হারামজাদা, ডাকিনি? দেব আখুনি খিঁচে এক চড় বসিয়ে—! ডাকিনি?"

রাগে আর খোকাবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না।

হারাধন মুখভারি করে' আবার বললে, "না, ডাকনি।"

খোকাবাবু টপ্ করে' উঠে' দাঁড়ালো। হারাধনের একটা কান ধরে' বললে,—"ওঠ্! চল্ দিদির কাছেই চল্—বোঝাপড়া হয়ে যাক্ ওইখানেই—চল্।"

হারাধনকে উঠ্‌তে হলো।

খোকাবাবু বললে, "আসুন মশাই, আপনিও আসুন।"

সিঁড়ির কাছ-বরাবর এসে আমায় আর-একবার সাবধান করে' দিলে। "বাঁদিকে তাকাবেন না মশাই, ওদিকটা আমি ভাড়া দিয়েছি—পট্ পট্ করে' নেবে আসুন সিঁড়ি ধরে।"

দিদির ঘরে তখন আরও দুজন লোক খেতে বসেছে। হারাণ তখনও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছিল।

দিদি বললে, "আমার ঘরে ও-সব ঝামেলি চলবে না ভাই, যাও আমার ঘর থেকে—ওপরে গিয়ে চেঁচামেচি করগে যাও।"

খোকাবাবু রেগেই জিজ্ঞেস্ করলে, "তাহ'লে আমি ডাকিনি?"

দিদি বললে, "না, ডাকনি।"

খোকাবাবুর চোখ দুটো তেড়ে উঠলো।—"বেশ, বেশ, না ডেকেছি ত' আমার সাতটা বাবা। আব যদি ডাকা হয় আমার সত্যি,...তাহ'লে ওর...।"

হারাধন বললে, "বাবা তুলো না বলছি তুমি!"

"বটে? বটে? দিই তাহ'লে এই হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে! শুনুন তবে শুনুন মশাই!"

খোকাবাবু আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত নেড়ে বললে, "শুনুন! ওই যে ওই দেখালাম আপনাকে,—বাঁদিকটা ভাড়া দিয়েছি—ওই ওদেরই সেই ছোট মেয়েটা—যুগ্‌লী,—মশাই স্বচক্ষে দেখেছি।—শুন্‌তে চান? আর শুনবেন?"

দিদি হঠাৎ রেগে উঠলো।

"বেরো তুই আমার সুমুখ থেকে, বেরো মুখপোড়া, সাদার গায়ে কাদা! দুধের ছেলে ওই ছোট মেয়ের নামে কলঙ্ক,—লজ্জা করে না মিছে কথা বল্‌তে? বেরো—"

খোকাবাবু বল্‌লে, "মিছে কথা? মিছেকথার ওপর আমি ভারি চটা। দুধের ছেলে? ছোট মেয়ে? মেয়ে আবার ছোট-বড় আছে কখনও? সব সমান—। সব আমার দেখা আছে। খোকাবাবুর দেখতে কিছু বাকি নেই। দিদিকেও জানে, দাদাকেও জানে।—"

আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে পথের মাঝে হারাধন আমায় ধরে' ফেললে।

"শুনলেন ত' মশাই? শালা কেমন-ধারা পাজি একবার দেখে নিলেন ত?"

ঘাড় নেড়ে আমি চলে' যাচ্ছিলাম।

হারাধন ছাড়বে না, জোরে-জোরে আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলো।

"কাকা বলে' ডাকি, কিন্তু ও আমার কাকা নয় বুঝলেন? ওর ঘরে থাকি আমি। এই—একটা চাক্‌রি-বাক্‌রি পেলেই আর থাক্‌ব না। পারেন একটা জোগাড় করে' দিতে?—কম-সম মাইনে—গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা হলেই হয়।"

আমার কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে সে আবার বলতে সুরু করলে,—

"লোকটি ত' আর কম নয়—পাজির পা ঝাড়া! অমন 'সেল্‌ফিস্‌' লোক বোধহয় 'ওয়ার্লডে' নেই। আমি পড়েছিলাম মাইনর ইস্কুলে। হাতের লেখা আপনি আমার দেখতে পারেন—বাংলা, ইংরিজি, দুই-ই ভাল।

"খোকাবাবুর ওই যে বাড়িটা, ওটা তিনবার 'মডগেজ' দেওয়া হয়ে গেছে। নীচের ওই ঘরটির জন্যে দিদিমণিকে দিতে হয় মাসে দশ টাকা। খোকাবাবু আমাকে কেন ডেকেছিল জানেন?"

এতক্ষণ পরে জবাব দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

হারাধন একটা ঢোক্ গিলে চলতে চলতে বললে,

"শুনুন তবে—যখন সবই বললাম। দুপুরবেলা যদি দেখেন খোকাবাবুকে—চেনে কার বাবার সাধ্যি! বেটা শয়তান! ময়লা ছেঁড়া একটা ন্যাকড়া পরে, হাতে একটা লাঠি নেয়,—অন্ধ ভিখিরী সাজে; লোকের বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। লাঠির আগায় ধ'রে ধ'রে আমি পথ দেখাই। কি আর করি—পেটের দায়! আধা-আধি বখরা। তাই কি আর ও দেয় ঠিক্? কোনদিন চার আনা, কোনদিন ছ'আনা।—আর যাচ্ছি না বাবা!...

"বলেছি আরও দু-একজনকে একটা চাক্‌রির জন্যে,—আর, এই আপনাকেও বলে রাখছি। হারাণবাবুকে চেনেন? দিদিমণির ঘরে খায়—সেই হারাণ বাবু? হারাণ অধিকারী? লোকটি বেশ ভাল লোক। ওঁকেও বলেছি। উনিও চেষ্টায় আছেন।"

দিদির কাছে আর খাব না ভাবছিলাম।

দুদিন গেলাম না।

তিন-দিনের দিন—রাত্রি তখন প্রায় বারোটা।

দিদিমণির ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম—কথাটা বলেই যাই।

...দরজা বন্ধ।

একবার ডাক দিতেই দরজা খুল্‌লো।

বল্‌লে, "আমার ভাই সজাগ্ ঘুম। বায়ু-চড়া ধাত—ঘুম আর আস্‌তে চায় না কিছুতে—

"আসনি যে দুদিন? ভাত-তরকারি আছে, বসো।"

মুখে কিছু বলা হলো না, বসলাম।

দিদির তক্তপোষের ওপর মশারি পড়েছে।

ভাত বাড়তে বাড়তে দিদি বল্‌লে, "শুয়েছিলাম ভাই—"

দিদি একবার তার মশারি-ঢাকা বিছানাটার দিকে ফিরে তাকালে।

"ও-বাড়ির ওই মেয়েটা এলো; বলে, দিদি শোব এইখানে। বলি, শো তবে—।"

বিছানার ভিতর কে যেন এপাশ-ওপাশ করছে মনে হলো; অস্বস্তিকর একটা ওঁ-আঁ শব্দও পাচ্ছিলাম যেন।

দিদি বললে, "জ্বর হয়েছে মেয়েটার—। ডিমের তরকারি, আজ আর বেশি রাঁধিনি ভাই,—কেমন হয়েছে খেতে?"

বমির শব্দে হঠাৎ পিছন্ ফিরে তাকালাম।

বিছানার দিকে পিছন ফিরিয়েই দিদিমণি আমায় খেতে বসিয়েছিল।

'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়!'

মশারি ফাঁক করে' একখানা মুখ বেরিয়ে পড়েছে।

দিদিমণি হতভম্ব হয়ে গেল,' কি যে করবে কিছুই ঠিক পেলে না; বিছানার কাছে আড়াল করে' গিয়ে দাঁড়ালো।

···আমি কিন্তু দেখেছি।

ও-বাড়ির মেয়ে ত' নয়! মেয়ে-মানুষের গোঁফ থাকে না।

মাথায় এক-মাথা চুল। তবে কাপড়ের রং গেরুয়া কিনা দেখতে পেলাম না।

এ আবার কোন্ ঠাকুরের পূজো করে কে জানে!

দিদিমণির মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছিল; বললে, "তোমার আজ খাওয়া হলো না ভাই, কাল একটু সকাল-সকাল এসো।"

বললাম, "আস্‌বো।"

কেনই বা আস্‌ব না?

শুকনো হাসি হেসে দরজাটা দিদি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে' দিলে।

মগের মুলুক

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মগের মুলুক যাবি কে ভাই মগের মুলুক যাবি
হেথায় যে-মন মাগ্‌গি সেথা সস্তাদরে পাবি
ওরে সস্তাদরে পাবি,
হা-হা না চাহিতেই পাবি।
মগের মুলুক যাবি কে ভাই মগ মুলুকে যাবি?

আইন নাহি নাইক কানুন নেইক দুয়ার দ্বারী
বাদশা রাজা নেইক কোথা কেতাব ভারি ভারি
ছেঁড়া কেতাব ভারি ভারি,
হা-হা খেতাব ভারি ভারি।

মগ-মুলুকে যাবি কে ভাই মগ-মুলুকে যাবি
মন যেটা চায় মনের সুখে করবি জোরে দাবী
ওরে করবি হেঁকে দাবী,
হা-হা দাবী দিলেই পাবি।
মগের মুলুক যাবি কে ভাই মজার দেশে যাবি!

খুঁজে যদি ধর্‌তে পারিস্ হাতের মত হাত
দিনগুলো সব ছোট্ট হবে বেড়েই যাবে রাত
ওরে   বেড়েই যাবে রাত,
হা-হা ফুরোবেনাই রাত।

মগের মুলুক যাবি কে ভাই মগ-মুলুকে যাবি
বুকের সদর খোলাই সেথা নাইক মনে চাবি
ওরে   নাইক মনে চাবি,
হা-হা জটিল ভাবাভাবি।
মগের মুলুক কে যাবি রে মগ-মুলুকে যাবি!

নৃত্য পেলে নাচে সেথা কান্না পেলে কাঁদে
ইচ্ছে হ'লে রান্না ফেলেও জড়িয়ে বুকে বাঁধে,
ওরে   ইচ্ছে হলেই বাঁধে
হা-হা   না জানিয়েই বাঁধে।

মগের মুলুক যাবি কে ভাই মগের মুলুক যাবি
যুবোর দেশে যাদুঘরে বুড়োরা খায় খাবি
ওরে   বুড়োরা খায় খাবি,
হা-হা মন-বুড়োরা খাবি।
মগের দেশে যাবি কে ভাই মজার মুলুক যাবি!

চাইলে সেথা ফুল ফোটে ভাই ডাক্‌লে ওঠে চাঁদ.
মেঘ করে ভাই ইচ্ছামত নদীর ভাঙে বাঁধ
ওরে   হৃদয়-নদীর বাঁধ,
হা-হা ক্ষ্যাপা হিয়ার বাঁধ।

মগের মুলুক কে যাবি ভাই মগ-মুলুকে যাবি
গান যদি পায়, সুর না জোগায় বেলয় সুরে গাবি
ওরে   তবুও তুই গাবি,
হা হা প্রলয় সুরে গাবি
মগের মুলুক কে যাবি ভাই মজার মুলুক যাবি!

সব বেহায়া নাইক হায়া সবাই সেথা পাজী
মেলে যদি মুনাফা উচ্ছন্নে যেতেও রাজী
উচ্ছন্নে যেতেও রাজী,
হা-হা রাজী তারা রাজী।

মিনি মালিক মুলুক, যেতে মাশুল নাহি লাগে
মূল্য বিনা মন মেলে ভাই মেগে নেবার আগে
ওরে   না চাইতেই আগে,
হা-হা   না চাইতেই আগে।
মগের মুলুক—বন্দরেতে শুল্ক নাহি লাগে।

সংগ্রহ

ম্যাক্সিম্ গোর্কির 'In the World' হইতে—

আবার ষ্টীমারে কাজ নিলাম। রাজহাঁসের মত সাদা ধব্‌ধবে ষ্টীমারটি—নাম পার্ম; যেমন চওড়া, তেমনি দৌড়্‌বাজ। এবার হেঁসেলের কাজ,—মাস-মাইনে সাত রুব্‌ল্; বাবুর্চ্চির তল্‌-পেটি।

ষ্টুয়ার্ডটির মোটা ফুলো চেহারা,—মাথাটি পাকা বেলের মত পরিষ্কার। সারাদিন হাতদুটি পিছনে রেখে তিনি ডেক্‌ময় পায়চারি করেন—গরমের দিনে শূয়োর যেন ছায়া খুঁজ্‌ছে! বৌ তার খাবার ঘরে মাতব্বরি করে। বয়স তার চল্লিশ হবে, রূপ এককালে ছিল, কিন্তু এখন যেন শুকিয়ে গেছে। মুখে সে এত বেশি পাউডার ঘষ্‌তো যে তার রঙিন জামাটা পর্য্যন্ত পাউডারের গুড়োয় সাদা হয়ে থাক্‌তো।

হেঁসেলে ছিল মোটা-মাইনের এক বাবুর্চ্চির রাজত্ব; —আইভান্ আইভানোভিচ্; ডাক-নাম ছিল—মেড্‌-ভিজেনোক্। ছোট্টখাটো মোটা মানুষটি, নাকটি খাঁড়ার মত, চোখ দেখলে মনে হয় যেন সবাইকে সে বিদ্রূপ করছে। বেজায় বাবু,—আড়ং-ধোলাই 'কলার' চাই—আবার রোজ না কামালে তার চলে না। গালের রং নীল্‌চে, কালো পাকানো গোঁফজোড়া ওপরে ঠেলে উঠেছে। এই গোঁফজোড়াই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান; অবসর পেলে রান্নার-কাজে-দাগী আঙুল দিয়ে গোঁফ-জোড়া পাকানোই ছিল তার কাজ—আবার একটি হাত-আর্শী দিয়ে মাঝে মাঝে দেখাও চাই।

তবে জাহাজের মধ্যে সব চেয়ে মজার লোক ছিল ইয়াকভ্। গোলগাল মানুষটি, বুকখানা চওড়া। থ্যাব্‌ড়া নাকওয়ালা মুখখানি মনে হতো যেন একটি তেলা-কোদাল। ঘন ভুরুর নীচে কফি-রংএর চোখদুটো ত' দেখাই যেতো না! খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়িতে গালদুটি ঢাকা—জলাজমিতে যেন শ্যাওলা ধরেছে। মাথার চুলগুলোও ঠিক তেম্‌নি। শক্ত সে চুলের ভেতর আঙুল চালায় কার সাধ্যি! মনে হতো মাথার ওপর আঁট্‌-সাঁট্‌ ঠিক যেন একটি টুপি বসানো।

তাসের জুয়ায় ছিল সে ওস্তাদ, আর তার নোলা ছিল ভয়ানক। অনবরত দেখতাম ঘুরছে ত' ঘুরছেই—রান্নাঘরের আশে-পাশে হ্যাংলা কুকুরের মত। মাংসের টুকরো, হাড়ের টুকরো—যা পায়……

রোজ সন্ধ্যাবেলা মেড্‌ভিজেনোকের সঙ্গে চা খেতে বস্‌তো, আর গল্প বলতো ভারি মজার মজার।

……কি আর করেনি! জোয়ান্ বয়সে ছিল রিয়াজিন্ শহরে। শহরের ভেড়িওয়ালার সঙ্গে কাজ করতো তখন। তারপর হঠাৎ একদিন এক মোহান্তর সঙ্গে দেখা। ভুলিয়ে সে তাকে এক মঠে নিয়ে যায়। বাস! সেই-খানেই গেল চারটি বছর কেটে!

"মোহান্তই ত' হয়ে যেতাম এতদিনে—বুঝেছ হে? ভক্তবিটেল্ আর-কি!, পেঞ্জা থেকে সেই যাত্রীটা এসেই ত' দিল সব মাটি করে'। মেয়েটা ভারি মোলায়েম ছিল হে! বলতো, 'বাঃ! খাসা জোয়ান্ তুমি! আর আমিও ভদ্রঘরের মেয়ে—অসহায় বিধবা, চল তুমি আমার সঙ্গে।' বলতো, 'আমার নিজের ঘরদোর রয়েছে, আর পালকের ব্যবসা—'

"আমারও ঠিক মনে ধরে' গেল। চলে গেলাম মেয়েটার সঙ্গে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পেয়ারের-লোক হয়ে গেলাম আর-কি! বাস্, তিনটি বছর তোফা আরামে—তুন্দুরের ভেতর গরম রুটির মত কেটে গেল।"

নাকের ডগার ব্রণটি ভালো করে' পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে মেড্ভিজেনোক বলতো, "মিথ্যের একটি বাদশা তুমি! মিথ্যেকথায় যদি পয়সা হতো তাহ'লে তুমি রাজা হতে।'

ইয়াকভ্ গুন্ গুন্ করতো শুধু। তার নির্ব্বিকার মুখের খোঁচা-খোঁচা নীলচে লোমগুলো একটু নড়তো; ঝাঁকড়া গোঁফগুলি কাঁপতো।

বাবুর্চ্চির কথা শেষ হবামাত্রই সে আবার আরম্ভ করতো—তেম্নি শান্ত অবিচলিতভাবে, "আমার চেয়ে ছিল সে বয়সে বড়; শেষটায় দিগ্ ধরে' গেল। কি আর করি, তখন জুটে গেলাম তার ভাইঝির সঙ্গে। একদিন সে ধরে' ফেল্‌ল, আর দিল ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বার করে'—।"

"—এবং বেশ করল, এর চেয়ে আর কী তোমার ভাল করবে?'' বাবুর্চ্চি ইয়াকভের মতই মোলায়েম ভাবে জুড়ে দিল।

জাল-খালাসী ইয়াকভ্ গালে এক ঢেলা চিনি ফেলে দিয়ে আবার সুরু করতো,

"তারপর এক ভবঘুরে বুড়ো ফিরিওয়ালার সাথে দেখা। দু'জনে তামাম্ দুনিয়া ঘুরে' এলাম—সেই কোথায় বালকান্ পাহাড়, আর কোথায় তুর্কি, কোথায় রুমানিয়া, আর কোথায় গ্রীস্, মায় অষ্ট্রিয়ার হরেক্ জায়গা,—কোনো জাত আর দেখতে বাকি রাখিনি। খদ্দের পেলেই গেছি সওদা বেচ্‌তে—তা সে যেখানেই হোক্।"

"—আর চুরি করতে।" গম্ভীরভাবে বাবুর্চ্চি বল্লে।

"বুড়ো ম'না করতো—বলতো, 'না বাপু, বিদেশ-বিভূঁয়ে সাচ্চা থাকাই ভাল, এ বড় কঠিন ঠাঁই, একটি চুল এদিক-ওদিক হলে গর্দ্দান যাবে।'—অবশ্য চুরি করতে আমি কসুর করিনি, তবে সুবিধে হলো না। এক বেটা সওদাগরের আস্তাবল থেকে ঘোড়াটি সরিয়েছি কি ধরে' ফেল্‌লে,—তারপর বেদম্ প্রহার দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল থানায়। আমরা ছিলাম দুটি; আমার জুড়িদারই ছিল আসল ঘোড়া-চোর, আমি একটু মজা করতে গিয়েছিলাম বই ত নয়! তার আগে কিছু দিন ধরে ওই সওদাগরের হামামে একটা নতুন চুল্লি বসিয়েছিলাম। আমি জেলে থাকতে সওদাগর পড়লো অসুখে, তারপর একদিন সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির! বলে 'ওকে ছেড়ে দিতে হবে।' আমাকে গো—আমাকে। আমার সম্বন্ধে নাকি সে ভারি খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছে। আমি নাকি এক মস্ত গুণী. আমায় না ছাড়লে তার সব্বনাশ হয়ে যাবে। আমি গুণী হয়ে গেলাম হে,—পিশাচসিদ্ধ! সওদাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল,—ছাড়া পেলাম।"

বাবুর্চ্চি বলতো, "আমি হলে তোমায় ছাড়তাম ভাল করে'। তিনটি দিন জলে চুবিয়ে রেখে তোমার স্থাকামি ধুয়ে বার করে দিতাম।'

ইয়াকভ্ কথাটা লুফে নিয়ে বলতো,

"যা বলেছ! আমি বেশ একটু বোকা। একটা গোটা গাঁয়ের লোককে বোকামি বিলোতে পারি।"

আঁট 'কলারের' ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে সেটা টেনে তুলে বাবুর্চ্চি রুক্ষস্বরে হেঁকে উঠতো,

"ছাই আর পাঁশ! আমি ভেবে পাই না.তোমার মত একটা বদমাস্ কেমন করে বেঁচে থাকে! কাজের মধ্যে ত শুধু গোগ্রাসে গেলা আর ঘুরে বেড়ানো! সংসারের কোন্ কাজটায় তুমি লাগো বলতে পার?"

চিবোতে চিবোতে জাল-খালাসী জবাব দিত,

"নিজেকেই কি ছাই আমি চিনি! বেঁচে আছি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। কেউ-বা শুয়ে কাটায়, কেউ বা ঘুরে বেড়ায়। কারুর-বা বসে বসে দিন যায়। কিন্তু খেতে বাবা সবাইকেই হয়।"

বাবুর্চ্চি আরও চটে যেতো:

"তোমার মত শূয়োরকে লোকে বরদাস্ত কি করে' করতে পারে?"

ইয়াকভ্ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "অত চটছ কেন

হে? সব ঠাকুরেরই খড়ের কাঠাম্। গাল-মন্দ দিও না ভাই, তাতে কি আর ভাল হব?"

এই লোকটি প্রথমে আমায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। অপরিসীম বিস্ময়ে আমি তার গতিবিধি লক্ষ্য করতাম, অবাক হয়ে তার কথা শুনতাম। মনে হতো জীবনের গভীর রহস্যের কথা যেন সে কিছু জানে। 'আপনি' সে কাউকেই বলতো না, আর তার ঘন ভুরুর তলা থেকে সবার দিকে চাইতো সমান ভাবে—নির্ভীক সরল চাউনি।

কাপ্তেন, ষ্টুয়ার্ড, প্রথম শ্রেণীর আরোহী, মাঝি, মাল্লা, ডেকের যাত্রী, সবাই—সবাই ছিল তার কাছে সমান।......

* * * *

পাঁক

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এখন সরকারী কল একমাত্র ভরসা! বেণেপুকুরের জল নাকি এমন পচে গেছ্‌ল যে তার বাতাসে সহরে মহামারী থামছিল না। কেন, তারা কি সব সে জল খেয়ে মরে ভূত হয়ে আছে? জলে পানা হয়ে রঙটা একটু না হয় সবুজই হয়েছিল। আর গন্ধ? তা জলে আবার কোন্ কালে আতরের গন্ধ পাওয়া যায়? শুধু সরকারের জলের কল বাড়াবার ফন্দি বইত নয়!—

তাই গরুর গাড়ির পর গরুর গাড়ি এল মাটি নিয়ে। পুকুর বোঝাই হয়ে গেল।

সরকারী কলে ভিড় একটু বেশী। তার আর উপায় কি?......"বলি ওঁগুলের মা! তোমার যে আর হয় না, সেই কোন্ বেলা থেকে বসে আছি, একটু বিবেচনা ত করতে হয়!"......

বালিকা, যুবতী বৃদ্ধার দল কলসী নিয়ে কল ঘিরে বসে থাকে।

......"তা কি কখন হয় বাছা! বলে—কিসে আর কিসে, ধানে আর শীষে! কলের সাথে পুকুরের তুলোনা! একটা কলে রাজ্যি-শুদ্ধু লোকের চলে?"......

......"তোর ত গতর আছে বাপু, আমাদের মত ত' আর বুড়োহাবড়া নস্, যা না বড় রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে আয় না!"

গতর, উৎসাহ ও কোঁদল করতে অনিচ্ছা থাকলে কেউ কেউ তাও যায়—তবে বড় রাস্তার কল অনেকটা দূর।

"আসতে যেতে কোমর ধরে যায় বাবা।"

তা ছাড়া তার পাশেই হিন্দুস্থানীদের বস্তি।

"মেড়ুয়া-মাগীর সঙ্গে কোঁদল করে কে পারবে বাপু, মাগী যেন সেপাই! তুই গাল দিলি আমি গাল দিলুম ফুরিয়ে গেল, আবার মারতে উঠিস্ কেন রে বাপু! তার চেয়ে আমার শেতলাতলার কল ভাল বাবা! তা দেরীই হোক্ আর যাই হোক্!"

আবার শেতলাতলার কলে ফিরে এসে বসে থাকতে হয়। পাশের স্যাকরার দোকানের ভেতর হাতুড়ি চলে ঠুক্ ঠাক্ ঠুক্ ঠাক্। স্যাকরার বকাটে বড় ছেলেটা টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে দোকান-ঘর থেকে রকে বেরিয়ে নির্লজ্জ ভাবে কলের দিকে চেয়ে তামাক সাজতে বসে।

কলের তলায় নাইতে নাইতে তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়টা টেনে তার কালীবরণ হাতীর মতন বিপুল দেহটির লজ্জা নিবারণ করবার নিষ্ফল চেষ্টা করে রাজী চাপাগলায় বলে—

"মর্ বেহায়া মিন্‌সে, চোখের মাথা খা!" লালমোহন কথাটা শুন্‌তে না পায় এমন নয়। গাল ফুলিয়ে কলকেটায় নিবিষ্ট মনে বার-কয়েক ফুঁ দিয়ে হুঁকোয় চড়িয়ে সে একটা টান দেয়, আরো একটা টান, তারপর, তারপর জোরে আর একটা টান। ধোঁয়ার রাশ মুখের ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠ্‌তে থাকে। নির্লজ্জ লালমোহন আবার কলেব দিকে চায়।

ফকরের ছ-বছরের উলঙ্গ মেয়েটা একবার সেদিকে চেয়ে দিদিমার কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে বলে—"ড্যাকরা আবার এদিকে চাইছে লো দিদিমা! চোখের মাথা খা! মিনসে!"

সবাই একবার ভ্রূকুটি করে লালমোহনের দিকে চেয়ে সে অভিশাপকে সমর্থন করে। লালমোহন ঘন ঘন তামাক টান্‌তে থাকে।

"কি হতচ্ছাড়া বেটাছেলে গা!"—একটি বছর-কুড়ির মেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে লালমোহনের দিকে বক্র ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি হেনে—ঝট্‌কা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কানের দুল গুলো দুলে উঠে। কানে তার শুধু দুল নেই, গায়ে আবার ব্লাউস্!

সে পটুলি!

এরি মধ্যে পটুলির পাড়ায় নাম-ডাক হয়েছে! এই সেদিন সে ধোপানি-মাসির ছুটো চালা ভাড়া করে হাবা খোঁড়া বরটাকে নিয়ে এসে উঠ্‌ল। এর মধ্যে কনে-বৌ বলে—"তিন কুড়ি দশ বছর বয়স হল মা, মুচির ঘরে এত ঢং কখন দেখিনি! খোঁপা বাঁধারি সে কত বাহার, আর কাপড় পরার—! কাপড়ের নীচে আবার জামা লো!"

ফকুরে আর নফ্‌রা আজকাল এক-পো পথ বেশী হেঁটে সোজা রাস্তা ছেড়ে ধোপানি-মাসির দরজা দিয়ে রোজ ভোরে জেটিতে যায় না কি! তারা নাকি আবার শিস্‌ও দেয়—!

তা হতে পারে, কালো পাথরে-কোঁদা সরস্বতীর মত পটুলির রূপ, আর চোখ?

সে যেদিন আসে সেই দিনই ত চারী বলেছিল, "এ ছুঁড়ি নিশ্চয়ই ভাই ডাইনি,—চোখ দেখছিস্ না, ঠিক সাপের মত।"

... ...

মেথর-পাড়ার পাশ দিয়ে ও বুড়ো কি জিজ্ঞেস করতে করতে আসে?

—বুড়ো বলে, "উল্টোডিঙ্গির পদ্‌মিনি ধোপানি কি এখানে থাকে?"

"কে জানে বাপু, এখন কি আর সেদিন আছে যে, গোণা গুন্‌তি কটি ঘর নিয়ে পাড়া, এখন অমন কত পদ্‌মিনি রুক্‌মিনি আস্‌ছে-যাচ্ছে কে খবর রাখে!"

বুড়োকে আরো এগিয়ে যেতে হয়। শুঁটকো দু' বছরের পুরোণো আলুর মত কোঁচকান চামড়া বুড়োর—তার লোমগুলিতে পর্য্যন্ত পাক্ ধরেছে।

"কাকে চাই বাপু!"—অঘোর মাটির গামলায় চামড়াগুলি ধুতে ধুতে জিজ্ঞাসা করে।

"না বাপু, পদ্‌মিনি বলে কেউ থাকে না এ পাড়ায়। মেছুয়া পাড়া ওই বড় রাস্তার ওপরে।"

পিঠের বোঁচকাটা একটু সরিয়ে নিয়ে বুড়ো আবার কুঁজো হয়ে লাঠির ওপর ভর দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে এগিয়ে চলে।—নোংরা সরুপথ, তরকারির খোসা, ছেঁড়া কাগজ, চামড়ার টুক্‌রো গোবর-কাদায় একাকার।

পেছন থেকে অঘোর ডেকে বলে—"রোশো রোশো

হতে পারে—পদ্মিনি ত নয় বাপু, পদ্ম বটে। ওই বেনে পুকুরের মাঠে একটু খোঁজ করে দেখত' বাপু- ওই নতুন বস্তিতে। পদ্ম বলে যেন এক ধোপানি নতুন ঘর করেছে বলে মনে হচ্ছে,—এই রাস্তা ধরে হোই নারকেল গাছ বরাবর চলে যাও।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করে—"উ পেঁড়্কা নগিচে?"

অঘোর বিরক্ত হয়ে বলে—"না গো না, ওই নারকেল গাছের কাছে যাও না।"

বুড়ো এগিয়ে যায়।

পদ্ম ধোপানির ঘরের পাশে আবার খুঁটি পোতা হচ্ছে। চারধারে চারটে খোঁটা পোতা ও সেগুলি নারকেল দড়ি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। আবার চালা উঠবে বুঝি।

বুড়ো ধীরে ধীরে গিয়ে নীরবে দাড়ায়। তারপর পিঠের বোঁচ্কাটা নামায়।

ওইত' পদ্ম নিজেই ঘরামির কাজ তদারক করছে! বুড়ো তবু অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেন?

পদ্ম কাজ দেখতে দেখতে একবার তাচ্ছিল্যভরে চোখ তুলে চায়। তারপর আবার চায়……

শাবল থামিয়ে গর্ত্ত থেকে হাত দিয়ে মাটি তুলতে তুলতে গগন বলে—"সব কাজে তোমার কর্ত্তামি করা দরকার, এ কাঁচা বাঁশের খুঁটি কদিন টিঁকবে শুনি! সস্তায় খুঁটি কেনা হয়েছে না আমার ইয়ে হয়েছে!"

কিন্তু পদ্মকে বারকয়েক চোখদুটো মিট্‌মিট্‌ করতে হয়।—না, ঘরেও বুঝি কাজ আছে। পদ্ম ঘরে গিয়ে ঢোকে। গতিটা যেন একটু অকারণে দ্রুত।

পেছন থেকে গগন কামড় খেয়ে হেঁকে বলে—"কি গো, মুখ-চোখ রাঙা করে ঘরে গিয়ে ঢুকলে যে বড়! কাঁচা বাঁশকে তা দিয়ে পাকাতে হবে নাকি আবার!"

বুড়ো কাউকে কিছু বলে না। বোঁচ্কার পাশে নীরবে বসে চারিদিকে তাকায় শুধু।—তা পদ্ম ধোপানির পয়সা আছে বইকি? টিনের চালই হোক্, আর মাটির চালই হোক্, এগার খানা কুঠরি ত বটে! তুলতে পয়সা লাগে না? আর জমি? ইজারা করাই না হয় বুঝলাম—কিন্তু কলকেতা সহরের ছ'টি কাঠা কি খেলার কথা?

না—পদ্মর পয়সা আছে বই কি, দুটিতে না-হয় নিজে থাকে—আট্‌টির ত ভাড়া পায়! আবার আর-একটা উঠছে! এ ছাড়া পেছনের লাইনবন্দী কুঠরিগুলো পদ্মর কিনা কে জানে!

পদ্মরই হবে, হাতের ওই নীরেট অন্ততঃ বিশ ভরির তাগাজোড়া কি আর নইলে অমনি হয়েছে! আর গলার দুটি ছড়া আসল গিনি সোনার হার!

গগন গর্ত্তের ভেতর খুঁটি পুঁততে পুঁততে জিজ্ঞাসা করে—"কি চাই বাপু তোমার?"

কিছু না, বুড়োর কিছু চাই না—।

তবে অমন করে এখানে বসে কেন?

বসে? এই এমনই—বুড়ো-মানুষ ক্লান্ত হয়ে বসেছে।—তা এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যেতে পারে?

সেই কথাই বল। ঘরভাড়া পাওয়া যেতে পারে বই কি। গগন উঠোনের এক কোণের একটা ঘর দেখিয়ে বলে—"ওই ঘরটা খালি আছে, তবে ছ'টি টাকা ভাড়া বাপু।"

বটে বটে, বুড়ো অমনি ঘরই খুঁজছিল একটি। বুড়ো উঠে দাঁড়ায় ঘরটি একবার দেখবার জন্যে।

পদ্ম হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

"ঢং করে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলে কেন? যাও এ হাতুখোরকে ঘরটা দেখিয়ে এস দেখি এখন।"—গগন আবার কাজে লাগে।

পদ্ম বুড়োর দিকে না চেয়ে—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে—বলে, "চলো।"

বুড়ো ঘর দেখতে যায়। লাঠি বোঁচ্কা পড়ে থাকে। বুড়ো না লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে এসেছিল?

ঘর পছন্দ হয়। না হবেই বা কেন? বুড়ো ঘর ভাড়া করতেই এসেছিল বটে, নইলে ও মেড়ুয়ার পদ্ম ধোপানির কাছে কিসের দরকার?

পদ্ম ধোপানি উড়ে-মেড়ো বড় বেশী পছন্দ ত' করে

না, বল্লে—"অমন ইল্লৎ জাত আর আছে? যে লোটায় জল খায়, আবার সেই লোটায় যায় পায়খানায়! ঝাড়ু মার অমন জাতের মুখে!"

পদ্ম বেশ কৈথ্য বর্লে! ঘটিকে বলে লোটা, আবার—ঝাড়ু!

শ্বেতাঙ্গিনী-নাট্টসমাজে তখন কি-একটা গান নিয়ে খুব হুল্লোড় চলেছে!

রাণী স্কুল থেকে এসে হাত-পা ধুতে ধুতে কাণ পেতে খানিক্ শুনে বল্লে, "মাকে বলে দেবো দাদা?"

চোয়াড় দাদা ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে এসে বল্লে,—"বল্‌না কি বলে দিবি? আমরা খারাপ গান গাইছি নাকি?"

"আচ্ছা, মাকে আমি আগে বলি—তারপর!"

"বল্ না, ভয় করি নাকি?"

গানটা কিন্তু নির্ভয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণ, এবং শশী ঘরের এক-কোণে ঘুমন্ত রেধোকে পা ধরে টেনে ঘরের মাঝখানে ফেলে সদর্পে "য়্যাক্ট" করতে সুরু করেছে। রেধো তার আগের দিন রাত জেগে যাত্রা শুনেছিল কোথায়, শশীর বীরত্বের আস্ফালনের মাঝে এক লাথি কসিয়ে দিলে।

"আচ্ছা আমি যাচ্ছি!"

খানিক বাদে পদ্ম ডাকলে, "মহাদেব!"

মহাদেবকে যেতেই হ'ল।

"ও-সব বেল্লিক গান গাইলে আমার ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় কেলাব্ খুলতে হবে বাপু!"

বেল্লিক গান! যাত্রার গান হ'ল বেল্লিক গান!

"হ্যাঁ, যাত্রার গান বই কি!"—রাণী বল্লে।

"বেল্লিক গান? তুই কি বুঝিস্! ভারী দু'দিন স্কুলে গিয়ে ফুটানি বেড়েছে—না?"

পদ্ম ধমক দিয়ে বল্লে, "ওকে ধমকাচ্ছিস্ কি? আমি কিছু জানিনা, না? যাত্রার কেলাব্ হয়েছে না যত গুণ্ডার আড্ডা হয়েছে! তেখন ত' আমায় বহুৎ বুঝিয়েছিলি কেলাব্ করে হেন হবে তেন হবে,- কি হল এই পাঁচ মাসে?"

—এখনও কিছু হয় নি বটে, তবে এইত সবে পাঁচ মাস, এখনও ত ভাল করে পার্ট মুখস্থই হয়নি কিনা, নইলে যাত্রায় আবার 'নাফা' হয় না?—এত বড় বড় পেশাদারী দলগুলো কি ঘাস খায়? তা ছাড়া তারা যখন আসরে নামবে তখন অমন পাঁচটা পেশাদারী যাত্রা কাণা হয়ে বসে পড়বে।—ওই যে তাদের 'নেলো'—এক রত্তি ছোঁড়া—বার করুক ত কে বার করতে পারে তামাম কলকেতার যাত্রার দল চুঁড়ে অমন একখানি গলা!—ও একাই ত রাজার আসর মাত করে দেবে! ওকে কি কমকষ্টে ধরে রাখতে হয়, বিপ্‌নে নাপ্‌তের দলের লোকেরা দশ টাকা মাইনে দিয়ে রাখবার জন্তে ঝুলোঝুলি করছে, কিন্তু বাবা সেটি হচ্ছে না! ডান হাতগুলো তারা বরং দিতে পারে,—'নেলো'কে ছাড়তে পারে না! আর—ওইযে 'গুলে' রাজা সাজে—

"তুই থাম্, ও-সব কথা বহুৎ শুনলাম এই পাঁচ মাস ধরে'—আর ও-সব চালাকি চলবে না। কেলাব্ করতে হয় অন্য জায়গায় কর গে বাপু, কি মাইনা ছটাকা করে লোকসান দিয়ে আমি বাঁদরামির আস্কারা দিচ্ছি না আর—"

"কি বাঁদরামি হয়েছে শুনি?"

পদ্ম রেগে উঠে বল্লে, "আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কি বাঁদরামি হচ্ছে! আমি কাণা, আমার আঁখ নেই, না? ও বামুনদের নচ্ছার ছেলেটা কি করতে আসে এখানে? ও কী যাত্রা করে শুনি? আর তোদেরই বা যাত্রা কখন হয় তা'ত দেখলাম না, হামেশাইত শুনি—হল্লা চলেছে, বামুনদের পাজি ছেলেটা ত' খালি খারাপ গান গায়, আর পট্টলিকে দেখতে পেলেই যা-না-তাই রসিকেতা করে,—এর নাম যাত্রা!"

কথাবার্ত্তার মাঝে গগন কখন্ নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল,

দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে, "বামুনদের ছেলে ত' নচ্ছার, আর তোমার ওই গুণধর ছেলেটি ধম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির, না? পালের গোদা কে তাহলে শুনি ? যাত্রার কেলাব্ করা হয়েছে! তখন তোমায় ঘর ছেড়ে দিতে পাঁচশবার বারণ করিনি? তখন যে ছেলেকে আদর দেওয়া হল। এখন আদুরে ছেলে মেয়ে-ছেলের সঙ্গে একটু রসিকতা করছে, কাল মেয়েমানুষ এনে মজা করবে, তা বল্লে চল্বে কেন?"—বিদ্রূপের চেষ্টা ছেড়ে হঠাৎ ক্রোধের সপ্তমে উঠে বল্লে, "জুতিয়ে তোমার পেজোমি ছাড়িয়ে দিতে হয়!"

মহাদেব জোয়ান ছেলে; রুখে উঠে বল্লে, "জুতোয় অমন সবাই, জুতো জুতো করতে বারণ করে দাও বলছি মা! নইলে ভাল হবে না।"

"ভাল হবেনা কিরে পাঁঠা!"—গগনও তেড়ে গেল।

পদ্ম দুহাতে তাকে আটকাবার চেষ্টা করে কাতর হয়ে মিনতি করে বল্লে, "দিচ্ছিলাম ত আমি মিটিয়ে তুমি আবার এর মধ্যে কেন এলে বলত?"

কিন্তু রোখ্ তখন চড়ে গেছে গগনের।

"খুন করে ফেলব আমি ওকে, ছেড়ে' দাও বলছি, পটুলির সঙ্গে ওর ইয়ার্কি করা আমি বার করছি!"

মহাদেব ভেংচে বল্লে, "ঈস্ ভারী তেজ!"

পদ্ম আর পারলে না, আটকাবার বৃথা চেষ্টা ছেড়ে বল্লে, "তাই কর, খুনোখুনিই কর, আমি সব ছেড়ে ছুড়ে চল্লাম। কেন, খুনোখুনি ছাড়া কি আর কথা হয় না? আজকাল আরো কথায়-কথায় দেখছি তোমাদের খুনো-খুনি করতে সাধ যায়। তবে তাই কর বাপু, আমি আর পারি না—।"

পদ্ম সত্যই ক্লান্ত হয়েছিল। কদিন থেকে তার যেন কি হয়েছে!

কিন্তু খুনোখুনি আপাততঃ স্থগিত রইল।

"তা আমি জানি, ও পেয়ারের-দুলাল ছেলেকে কিছু বলবার জো আছে? তুমি চক্ষে একেবারে তাহলে অন্ধকার দেখবে! নাও, তবে আর মিছিমিছি—ওকে ঘর ছাড়তে বলছিলে কেন?—ওকেই আর দুখানা ঘর ছেড়ে দাও, বাবুর যাত্রার কেলাব্ একটা ঘরে কি ধরে?"

গগনের বিদ্রূপের উত্তরে একটা অসীম তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গী করে মহাদেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পদ্ম হেঁকে বল্লে, "কাল থেকে তোমার ইয়ারদের এখানে আসতে মানা করে দাও মহাদেব, ওঘরে কাল থেকে আমি ভাড়া বসাব।"

"একি আমাকে আপ্যায়িত করতে নাকি? আমার দরকার নেই। তোমার ছেলে যাত্রার কেলাব্ করুক, পটুলির সঙ্গে ইয়ার্কি দিক, আমার কি?"

গগন একেবারে উদাসীন হয়ে নিজের মনেই বোধ হয় বলে যেতে লাগল, "হয়েত গেছেই, আর বাকি কি? কাল দেখি পটুলির ঘরের পেছনের জানালায় টোকা দিচ্ছে! অমন ছেলের মুখ আঁস্তাকুড়ে ঘসে দিতে হয় না! মেয়ে-ছেলের মান ইজ্জৎ রাখতে জানে না! তখনই দিতাম আমি জুতিয়ে লবেজান করে, শুধু পটুলির মুখ চেয়ে চুপ করে রইলাম, এমন কেলেঙ্কারী একটা জানাজানি হয়ে গেলে লোকে পটুলিকেই ত দুষবে! আর পটুলির যা স্বামী! পটুলিকে বলে দিলাম, জানালায় আর টোকা দেয় ত গায়ে গরম ফেন্ ঢেলে দিস্, নিজের ইজ্জৎ নিজের হাতে—"

পদ্ম হেসে বল্লে, "তুমি আর হাসিও না, বাপু, পটুলির আবার ইজ্জত, তার আবার অপমান! পটুলির সঙ্গে ফষ্টি নষ্টির কথা অমনি কথার-কথা বলেছি বইত নয়; এমন জোয়ান বয়সে কত হয়! ঘরটা খালাস করা নিয়ে আমার দরকার। সেটা হয়েছে, তাহলেই হ'ল। আর যা খুসী করুক না কেন আমাদের নজর দেবারই বা দরকারটা কি?"

গগন এ প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লে, "তা বই কি, চোখের ওপর একটা ভালো মানুষের মেয়ের সব্বনাশ করুক, আর আমরা বসে বসে বাহবা দি, কেমন?

পদ্ম এবার শুধু একটু হাসল।

গগন আরো রেগে বল্লে, "আমি এই বাঁদরামির বিহিত করব তবে ছাড়ব, এই তোমায় বলে রাখলুম।"

পদ্ম অবাক্ হয়ে বল্লে, "খাম্‌কা কেন গোঁসা হচ্ছ বল দেখি? কিঁ তোমার সতী-সাবিত্রী পটুলি, যে তার সঙ্গে একটু ফষ্টি-নষ্টি করেছে বলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে! বয়সকালে ওঁসব আবার ধর্ত্তব্যি নাকি?"

গগন এবার উত্তর না দিয়ে রাগে মুখ রাঙা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশ

ন্যুট্ হাম্‌সুন

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

এমন অনেক লোক আছেন বই লিখে যাঁরা পেট চালান, —বই লেখা যাঁদের পেশা। তাঁদের নায়ক-নায়িকার মাথার উপর মিথ্যার বোঝা চাপিয়ে যদি তাঁরা না দেন,—তারা সত্যিই যা, তার চেয়েও হীন করে' যদি তাদের না আঁকেন,—ভাল কথা। আরও ভাল হয়,—পড়ুয়াদের মন নেবার জন্যে তাদের যদি একটুখানি খোসামুদি করতে পারেন,—তা সে কমই হোক্, আর বেশিই হোক্। আর সেটা যদি নেহাৎ খেলোই হয়, বা খোলাখুলিই হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না। নিজেদের বেশ একটুখানি জবুকালো-রকমের রং-চোঙা দেখলে পড়ুয়াদের বরং ভালই হয়ে থাকে,—এই ত' আমার ধারণা। রং-বেরংএর সাজসজ্জায় মানুষকে ত' কতকটা মোরগের মতই দেখায়! আর এ-কথাও ত' আমাদের ভুললে চলে না যে—এই যে পাখ,—সে আজ না হয় উড়বার কথাটাই বেমালুম ভুলে গেছে, কিন্তু মাটির উপর দিয়ে গ্রামভারি চালে হেঁটে' ত' বেড়ায়! আর বেড়াবেই বা না কেন? দুনিয়ায় সে যে শুধু লাথে-লাথে বাওয়া-ডিম জোগান্ দেয় তা ত' নয়,—ঠেলাঠেলি রেশারেশির হাটে জয়ের দামটাও ত' সে ভাল রকমই বোঝে!

এমন লেখক আছেন যাঁরা শক্তিমান, কিন্তু সেই শক্তি তাঁদের 'বাই' হয়ে ওঠে,—'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে' তাঁরা কাজ করেন; বই তাঁদের লিখতে হয় যশের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে। নিজেদের বিশেষত্ব দেখাবার সে আকাঙ্ক্ষা অবশ্য তাঁদের ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত। সাধারণ 'শুধু-মানুষের' প্রাণান্তকর ভিড় থেকে সেই আকাঙ্ক্ষাই তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখে, এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে চান,—দেখে মনে হয় তাঁদের সকল স্বার্থ সকল মনযোগ যেন সেই পক্ষীরাজের গলা ও মাথার ঝুটি, রংদার পাখা-পালক আর চটুলতার মধ্যেই আবদ্ধ। সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, পড়ুয়াদের ভক্তি-গদগদ বাহবাধ্বনি, আর মেয়েদের প্রাণপাতকরা কৌতূহল —এ না হলে তাঁদের চলতেই পারে না; এমনি-সব নানাম্ রকমের হৈ-চৈ তাঁদের মাথায় ভিতর ঢুকে মদের কাজ করে—ফিরে ফিরতি কলম ধরবার জন্যে কেবলই

খোঁচা দেয়। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকেরা কালের স্মৃতি পটে নামগুলি তাঁদের না পারেন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রেখে যেতে—না পারেন বেশিদিন বেঁচে থাকতে। অথচ বাস্তবিক, সাধারণভাবে ধরতে গেলে 'সাহিত্য' এঁরাই সৃষ্টি করে' যান ;—মধ্য-যুগের নাম-না জানা যে সব শিল্পী অত্যাশ্চর্য্য মন্দির তৈরী করে' রেখে গেছেন,—এঁদের তুলনা শুধু তাঁদের সঙ্গেই চলতে পারে।

এ-ছাড়া এমন রূপদক্ষও আছেন,—অসাধারণ যাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও অভিনিবেশ, এবং অপূর্ব্ব যাঁদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি। অন্যে যা দেখতে পায়নি সেই বস্তু তাঁরা দেখতে পান, ইতিপূর্ব্বে অন্যে যা বুঝ্তে পারেনি তাই তাঁরা বুঝতে পারেন, নিতান্ত সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে আবিষ্কার করেন তাঁরা। এঁদের বই পড়তে পড়তে সর্ব্বদাই মনে হয়,—কথা যেন এঁরা জনসাধারণের সঙ্গে কইছেন না,—মনে হয়, তাঁদের মতামতের মূল্য বোঝ্বার, তাঁদের রচিত 'জীবন-বেদের' অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করবার মত এমন কোনও অন্তরতম প্রিয় সাথী তাঁদের আছে,—যাঁর সঙ্গে তাঁরা কথা ক'ন। (হতে পারে—বাহ্যজগতে এমন কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব হয়ত একেবারেই নেই ; রূপদক্ষের মানস-প্রসূত সে। তাঁর সেই গল্পসাথী যে একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, নিঃসন্দেহ ; কারণ সে গল্পসাথী হচ্ছেন রূপদক্ষ স্বয়ং। বিরাম নেই, মাত্রা নেই, ছেদ নেই,- একান্ত অকপটে আনাতোল্ ফ্রাঁস্ যে তাঁর কোনও বন্ধুর সঙ্গে, কিংবা কোনও সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে কেবলই কথা কয়ে চলেছেন—এরকম একটা ছবি ত' আমি মনে মনে কল্পনাও করতে পারি না।) এঁরাই হচ্ছেন আর্টের জয়শ্রীস্তম্ভ, "দুর্নীতিপরায়ণ" পুস্তকের রচয়িতা, সাহিত্যের রাজ্যে স্বেচ্ছাচারী এঁরা। সাহিত্যের এক-একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী, এক-একটা বিশিষ্ট ধারা এবং সুরের সৃষ্টি এঁরাই করে যান।

ন্যুট হাম্‌সুন হচ্ছেন পৃথিবীর এই শেষোক্ত রূপদক্ষের দলের। কিন্তু আমার ধারণা—এঁদের মধ্যেও তিনি অনন্য-সাধারণ। বর্ত্তমান যুগ-সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ বিশিষ্ট সৃষ্টিকুশলী আর কে আছেন আমার জানা নেই। আমার মনে হয় যা সত্যিকারের আর্ট নয়, আর্টের অনুসারী ছায়ামাত্র—এমন কোনও 'পন্থা' বা 'ভঙ্গী'র দিকে তাঁর কোনও ভ্রূক্ষেপ থাকে না। আসল আর্ট বিজ্ঞানের মতই "দ্বিতীয়া প্রকৃতি"র সৃষ্টি করে; তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষের চারিদিকে ধীরে-ধীরে সযত্নে যে "দ্বিতীয়া প্রকৃতি"র জালাবরণ বিস্তৃত হয় বাইরে থেকে—আর্ট তাকেই সৃষ্টি করে আমাদের অন্তর্লোকে!

হাম্‌সুনের বইগুলি বাইরের সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার বিবর্জ্জিত—যেন মানবজাতির ধর্ম্মোপদেশ। একটি অখণ্ড উজ্জ্বল অথচ সহজ সত্যের মধ্যেই তাদের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিহিত, এবং সেই সহজ সত্যের কল্যাণে সে যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে নরওয়েবাসী তাঁর নায়ক-নায়িকার চিত্রগুলিকে পুরাতন গ্রীসের প্রস্তর মূর্ত্তির মতই সর্ব্ববাদীসম্মত সৌন্দর্য্যে সুষমায় অপরূপ করে' তোলে। পড়ুয়'দের জন্যে তিনি লেখেন না,—কোনও "প্রিয়তমের" জন্যেও নয়। না! আমার ঠিক এই রকম মনে হয়: সকল মানুষের মাথার উপরে শত যোজন ঊর্দ্ধলোকে এমন একজন কেউ আছেন, যাঁর কাছে হাম্‌সুন তাঁর সকল কথা—যা জানেন, যা বোঝেন—তাই বলে' যান।

গল্প বলতে বলতে মাঝে মাঝে তিনি থামেন আর ভাবেন। আমার মনে হয়, হাম্‌সুনের বক্তব্যের আসল প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তাঁর ধ্যান-ধারণার মধ্যে মানুষকে শিক্ষা দেবার "পণ্ডিতী" ইচ্ছা মোটেই নেই। নৈতিক তত্ত্ব বা সামাজিক মতবাদের দ্বারা মন তাঁর অভিভূত নয়। অন্তর তাঁর স্বাধীন, সংস্কার-মুক্ত—এই আমার ধারণা।

"সত্যিই" তিনি বলেন, "এই দুনিয়ায় সবাই আমরা ভবঘুরে·····।" সে কথা তিনি বলেন, কিন্তু তার উপর কোনও জোর দেন না। দুঃখবাদী তিনি নন। তাঁর "ভবঘুরেরা"—সবাই যেন মাটির রাজা। যাঁদের তিনি

সৃষ্টি করেন—ছোট্ট অনাড়ম্বর দেশের মানুষগুলি—সবাই যেন বীর। "মার্টিন্ গ্রোডের" (Growth of the Soil) আইজাক্—সে এক মহাকাব্যের নায়ক। এজ্জা যদি সত্যিই না থাকতো, সে আপনার নিজের এজ্জা নিজেই তৈরী করতো; তার কল্পনা থেকে 'থর্' আসতো, 'ক্রিয়া' আসতো, 'সিগড়্' আসতো, এমন কি 'লোকের'ও উদ্ভব হতো। হ্যাঁ—'লোকের'ও—কারণ, মন্দ যা, তাকেও একটা পদ্ধতির মধ্যে এনে ফেলা দরকার। শয়তানের মাথাটা শেষে ছিঁড়ে ফেলতে হলে তারও কাঁধের ওপর প্রথমে আর-একটা নতুন মাথা গজাতে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়,—আইজাকের মত কেউ না কেউ "লোকের" মাথাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবেই একদিন। তারপর প্রত্যেক ভদ্রলোকের যে কাজ বহুকাল পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল সেই কাজ সে করবে—নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে এই দুনিয়ায় সে বসবাস করবে,—মাথার উপরে ওই আকাশের সংস্কার করবে,—আরও দয়ালু, আরও ঠিক মানুষের মত দেবতায় আকাশটা পূর্ণ হয়ে থাকবে। পাছে এই আকাশের বিরাট শূন্যতা বুকের ভিতর ঢুকে খাঁ খাঁ করে এই ভয়ে আমাদের ভবিষ্যতের সেই বুদ্ধিমান হৃদয়বান ব্যক্তিটি 'আকাশকেও শূন্য থাকতে দেবে না।—পৃথিবীর বল্‌তে যা-কিছু সবেতেই কুমারী দেস্পার্দ যেন একেবারে মগ্ন, তন্ময় হয়ে যেতো,—তা সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক্! সবেতেই তার একটা একগুঁয়েমির ভাব ছিল।—

এই কথাগুলিতে হাম্‌সুন্ যেন ঠিক ঋষির মত উদার একটা শান্ত বিদ্রূপের ভাব ব্যক্ত করেছেন। 'এই পৃথিবীর বলতে যা-কিছু'—এই কথাটি ছাড়া দুর্ভাগা মানবজাতির দুঃখ-কষ্ট আর কিসে ভাল বলা যেতে পারে? এই পৃথিবী—মানুষের পায়ের নীচে মুহূর্ত্তের মধ্যে যা কেঁপে উঠে গুঁড়ো হয়ে যায়, একটি নিমেষের মধ্যে হাজার-হাজার লোক যেখানে মরে যেতে পারে,—লিস্‌বন্, মার্টিনি, মেসিনা আর জাপানে যেমন হলো—জেনে' শুনে' 'সেই ধরিত্রীর শূন্য গর্ভের মধ্যে বসবাস করবার-শাস্তি যে দুর্ভাগা মানুষকে ভোগ করতে হয়, সেই মানুষের জীবনের সমস্ত অর্থ যেন শুধু ওই একটি কথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে,—'এই পৃথিবীর বলতে যা-কিছু!' এর জন্যে কি মানুষকে দোষ দেওয়া যায়? মানুষ যে আর-কিছু করেনি, শুধু তার নিজের সান্ত্বনার জন্যে নিজের দেবতা নিজে সৃষ্টি করেছে, এর জন্যে কি মানুষকে দোষ দেব? সমস্ত যন্ত্র-বিজ্ঞানের মধ্যে যে রহস্য লুকানো রয়েছে, মানুষের হাতে-গড়া এই দেবতার মধ্যে আমি ত' সেই রহস্যেরই সন্ধান পাই! সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতার ধারণার মধ্যে একটা সঙ্গতি বা একটা সুষমা খুঁজে পাবার জন্যই কি দেবতার সৃষ্টি হলো না? মানুষের মন-গড়া শিশুই কি মানুষের হাতে তার আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র নয়?

'Martin's Gróde,' 'The Woman at the Well', 'Sisste Kapitel'—হাম্‌সুনের শেষের-লেখা এই বইগুলি পড়তে পড়তে প্রত্যেকের মনে হবে—তিনি যেন এমন এক-জনের সঙ্গে কথা বলছেন যাঁকে একমাত্র তিনিই জানেন, আর তিনিই দেখেছেন। তিনিই হয়ত 'সৃষ্টির আদিভূত কারণ'—কিম্বা হয়ত' তাঁর কথার সাথী হবার জন্যে হাম্‌সুন তাঁর এই দেবতাটিকে নিজের হাতে তৈরী করেছেন। তাঁর এই দেবতার কাছেই নরওয়ের এই অসাধারণ লেখকটি তাঁর নায়কদের গল্পগুলি বলে চলেছেন, মহাকাব্যের সহজ সরল গতির চেয়েও অদ্ভুত সে গল্পের গতিভঙ্গি। "মার্টিন্ গ্রোডের" 'ইঙ্গারের' গল্পে তিনি বলেছেন,—"সমস্ত মানবজাতির মধ্যে একান্ত নগণ্য সে নারী—এই বিরাট সমষ্টির মধ্যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর সে।"—এমনি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের নায়িকার বর্ণনা।

অতি তুচ্ছ বর্ণবৈচিত্র্যহীন ব্যক্তিদের চরিত্রবর্ণনের যে অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় হামসুন্ দিয়েছেন, তাঁর আগে এমনটি আর কেউ দিতে পারেন নি। মানুষ কখনও বৈচিত্রহীন হতে পারে না,—এই সত্যটি একমাত্র তিনিই যেন আবিষ্কার করলেন। বহুতর ক্ষীরধর্ম্মী পিপীলিকার বাস এই পৃথিবীতে,—বিনাদোষে যাদের শাস্তি হচ্ছে

মৃত্যু।' নিজেদের হতভাগ্য জীবনগুলিকে মহিমান্বিত করবার জন্যে অনেক কিছু করছে তারা,—পাহাড় কেটে নগর গড়ে তুলছে, যা কিছু সুন্দর সবই সৃষ্টি করছে তারা, অথচ সামাজিক জীবনের অবস্থা তাদের অত্যন্ত কষ্টকর অসহ্য বললেও হয়।

অন্ধতমসাবৃত এইসব ভয়ঙ্কর জীবনের গল্পগুলিই হামসুন তাঁর গল্পসাথীকে বলে চলেন। কণ্ঠে তাঁর এক অদ্ভুত ব্যাকুলতার সুর বেজে ওঠে! মাঝে-মাঝে রাগ হয়, কিন্তু সে রাগ মনের মধ্যে চেপে রেখে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন,

"এ-সবের কারণ কি তুমি জান? বীর আমরা,—'সহীদ্' আমরা, অথচ পরস্পরের কাছে এত হীন এত তুচ্ছ হয়ে যাই কেন বলতে পার? বুঝতে পার কি,—আমরা কেন এত ভাগ্যহীন?"

সাথী কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। হয়ত' হিংসা হয়, তাই চুপ করে' থাকে, কিম্বা হয়ত' ঠিক। তাঁরই মত কারণ খুঁজতে গিয়ে সেও দিশেহারা হয়ে পড়ে।

"জানি" এই অসাধারণ রূপদক্ষ ন্যুট হাম্‌সুন্ বলেন, "জানি, জীবনটা এমনি, তা জানি। কিন্তু কেন বল দেখি? বল্‌তে পার?"

জবাব মেলে না।

হাম্‌সুন্ তখন আবার সুরু করেন, আরও আশ্চর্য্য সরলতার সঙ্গে আবার আর এক গল্প আরম্ভ করেন,—কোন্-এক অজানা পাপের জন্যে কোন্-এক মানুষ জীবনে তার অশেষ যন্ত্রণা সয়ে গেল—তারই গল্প।

"দুনিয়ায় আমরা সবাই ভবঘুরে" তিনি বলেন, "হাঁ তা জানি! কিন্তু কেন? ভবঘুরেই বা হতে গেলাম কেন? কিসের জন্যে? কত পরিশ্রমই না করলাম এখানে! এরই মধ্যে পৃথিবীকে ত' কত সুন্দরই না করে' তুললাম! ভাল কাজও ত' কিছু করেছি! পরস্পরকে ভালবাসবার, শ্রদ্ধা করবার দাবীও ত' সেজন্যে করতে পারি আমরা! তবে কেন নিজেদের এত কষ্ট দিই—জান? এর উদ্দেশ্য কিছু বুঝতে পার কি তুমি?"

কিন্তু কোনও জবাব তিনি পান না।

লোকটা হয়ত' বোবা, হয়ত' কালা, হয়ত' আকাট মূর্খ, কিম্বা হয়ত প্রচণ্ড পাজি,—এমনি একটা লোকের সঙ্গে সারা জীবন-ভোর কথা কয়ে হাম্‌সুনের আদর্শমত এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা,—সে এক অতিবড় দুঃসাহসীর কাজ,—সে যে কত শক্ত বলা যায় না।

আমাদের সৌভাগ্য যে এরকম কোনও দৈত্যের অস্তিত্ব নেই, আর হাম্‌সুনের মত জীবন-ধেয়ানীরা 'লোকে'র কাঁধে মাথা গুজাতে দেন শুধু সময়মত ছিঁড়ে' ফেলবার জন্যেই।

অনুবাদক—শ্রীসুবোধ রায়।

জোহানের বিহা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ফাগুনে 'বাহা'-পরব। জোহানের তখন 'বিহা' হইবে।

মাঘের শেষ; 'জাড়্' তখন গাছে-পাতায়। জোহানের খুশীর আর সীমা নাই!

গুঁড়া কয়লার খোয়ায়-বাঁধা কয়লা-কুঠির পথ; আর সেই পথের ধারে লাইন্-বন্দি কুলির বস্তি। দু'নম্বর ধাওড়ার সুমুখে প্রকাণ্ড একটা দেশী কুলের গাছ, কুল ধরিয়াছিল বিস্তর, কিন্তু পাকিতে-না-পাকিতেই বাঁদরে-ছেলেয় সব শেষ করিয়া দিয়াছে। সকালে সেই ন্যাড়া কুলগাছের তলায় বসিয়া জোহান্ রোদ পোয়ায়, বিকালে মদ খায়, আর নেশার ঝোঁকে আপনমনেই গান করে—

"মা গো মা!
বিহা দিলি না।
কল্-গাড়িতে চেপে যাব
দেখতে পাবি না।"

মেজ-ভাই বোহান্ খাদের নীচে কয়লা কাটে, ছোট ভাই মোহান্ তখন গাড়ি ঠেলে। ছুটি পায় সন্ধ্যাবেলা, পূবের সুয্যি পছিতে,—বেলা তখন 'লিছি-লিছি'।

বোহান্ বলে, "হঁ, গিল্—মদ গিল্ খুবমস্তে, আর গায়েন্ গা। বিহা যেমন আর-কারু হয় না......

জোহান্ সেকথায় কান দেয় না; মদ খায়।

বোহান্ বলে, মর্ কেনে ইবারে তুঁই! মরে' গেলেই খালাস!

জোহান্ কট্‌মট্ করিয়া চোখ তুলিয়া চায়।

বোহানের রাগ ধরে। বলে, তাও যদি না খোঁড়া হথিস্...তাও যদি বাঁ-ট্যাংটো গোটা থাক্‌তো...

ভাই-এর মুখে তার খোঁড়া পায়ের ইঙ্গিত ভাল শোনায় না।

জোহান্ বলে, "খোঁড়া—খোঁড়া—আমি খোঁড়া। তাতে তুর্ কি?

বোহান্ এইবার চুপ করিয়া থাকে—।

নেশার ঝোঁকে জোহান্ বলে, "এমন কত হয় কয়লা-খাদে! হর্‌খুর্ বুন্‌টো যে সেদিন মরেই গেল।"

বচসা করিতে করিতে বোহানেরও নেশা ধরে। বলে, "তাই বলে' বিয়া তুর কেউ দিবেক্ নাই।"

জোহান্ তার লালরঙের চোখদুটা তুলিয়া বলে, "আসুক্ ফাগুন, তাবাদে দেখেই লিস্।"

বোহান্ হাসে। বলে, মুংরা মাঝির মিছা কথা।"

কথায় কথায় হঠাৎ তাহার একটা ছড়া মনে পড়ে; বাউরীদের একটা মেয়ের কাছে শেখা।

জোহানের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলে,

"ইয়ার দেখে' উয়ার দেখে' ফেটে যায় মোর হিয়া,
খি-পাঁচ-ছয় সুতা নিয়ে দে মা আমার বিয়া!"

বোহানের হাসি আর থামে না!

হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া যায়।

জোহান্ বলে, "শুন্! এই দেখ্ ভাল্!"

বোহান্ ফিরিয়া তাকায়।

"মুখে পোঁকা পড়্‌বেক্,—গলন্ত-কুষ্টি হঁয়ে যাবি।"

বলিয়া জোহান তাহার হাতের আঙুলগুলিকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মত জড় করিয়া হাতদুইটি তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলে, ""হা দেখ্ ভাল্!—এম্‌নি।"

মোহান্ আর কথা বলে না, মুখ ফিরাইয়া ধাওড়ায় গিয়া ঢোকে।

জোহান্ বলে, "বড় দাদা হই, মানুষ করেছি তুখে নিমক্হারাম!"

এবং শুধু এই বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সাক্ষাতে যাহা বলিতে পারিল না, অসাক্ষাতে তাহাই বলিতে সরু করে,—

বলে, "আমার বিয়া হবেক্ শুনে' শালার হিয়া গেল ফেটে! বাদেই মরল শালা-ভাই না আমার ইয়ে!...... হবেক্ নাই? আমার হবেক্ এগুতে,—আমি বড় ভাই। তাবাদে তুদের। হয় হবেক্—না হয় না হবেক। তাতে আমার কি? তাই বলে' আমার বৌটি ত' আর তুখে দিছি নাই রে শালা হারামজাদা বেটা খচ্চর!"

দাঁত কটমট্ করিয়া জোহান্ একবার তাহাদের ধাওড়ার দিকে ফিরিয়া তাকায়; সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না। বলে,

"মুংরা মাঝির মিছা কথা? মাইরি-আর-কি! তুর্ কথাতেই! অত-অত মদের দাম লাগে না? ছাগলটো দিলম্ তবে অম্নি-অম্নি?"

—যাক্, এতদিনে বুঝা গেল। এই তিন-ভেইয়াদের খয়রা-রংএর বড় ছাগলটা সেদিন হারাইয়াছে বলিয়াই গুজব্। ছাগলটা তাহা হইলে হারায় নাই।

বগল-দাবা লাঠি দুইটা তুলিয়া লইয়া জোহান্ সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বাঁ-পায়ের হাঁটুর নীচে-অবধি কাটা।

"যাই আবার, বেটা কি বলে শুনি।"

মুংরা মাঝি থাকে সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায়। সেখান হইতে অনেকখানি পথ।

—তা হোক্।

দুই হাতে দুইটা লাঠি ধরিয়া সে এক অদ্ভুত উপায়ে জোহান্ পথ চলিতে লাগিল।

বাঁ-হাতের মাংসপেশীগুলা বেশ শক্ত সবল; জোর বোধকরি ওই-হাতেই বেশি পড়ে।

সাইডিং-লাইনের ওপারে গাদা-করা কতকগুলা কয়লার পাশে ছোট ভাই মোহানের সঙ্গে দেখা। হাতে দুইটা মোটা-মোটা রূপার বালা,—অন্ধকারে মন্দ দেখায় না! শিকে-ঝোলানো কেরোসিনের মগ-বাতিটার মুখে ভর্ ভর্ করিয়া বিস্তর ধোঁয়া বাহির হইতেছিল।

দাদাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "ওকাতেম্ চালাঃ' আ?"—অর্থাৎ যাস্ কোথা?

জোহান্ বলিল, "ছাগল খুঁজতে।"

মোহান বলিল, "আঁধারে যাস্ না; তুঁই ঘরকে চল্।"

"না, দেখে আসি।"

"ছাগল এসেছে। তুঁই জানিস্ না দাদা।"

"জানি, জানি—।"—বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জোহান্ আগাইয়া গেল।

মোহান্ আর-কিছু বলিল না। হাত পাঁচ-ছয় গিয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। অদূরে পুরাতন পরিত্যক্ত সিঁড়ি-খাদের মুখে বোয়ানের ঝোপগুলা পার হইয়া মনে হইল যেন জোহানের অন্ধকার অবয়ব ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে;—লাঠির ঠুক্-ঠাক্ শব্দ হইতেছিল।

তিন-নম্বর কুলি-ধাওড়ার সুমুখে কয়লার গাদায় আগুন ধরানো হইয়াছে। তাহারই জলন্ত শিখায় পথের অনেকখানা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। খোঁড়া জোহান্‌কে দেখিবামাত্র বাউরীদের কতকগুলা উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহার পিছন ধরিল।

"—খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং
ছাগল চরাতে যেঁয়ে ভাঙ্গাই এলো ঠ্যাং
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং!—"

ঠ্যাঙ্গা উঁচাইয়া জোহান্ তাহাদের মারিতে গেল। ভয়ে কতকটা পিছাইয়া গিয়া তাহারা আবার সুরু করিল,

"—ডান-ট্যাংটো লটর্-পটর্ বাঁ-ট্যাংটো খোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোঁড়া !—"

জোহান্ আর সেদিকে ফিরিয়া তাকাইল না, বিড়্ বিড়্ করিয়া কদর্য্য ভাষায় তাহাদের গালাগালি দিতে দিতে সে আগাইয়া চলিল। অথচ একটি মাত্র পায়ের জোরে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যায় না।

সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ায় যখন সে গিয়া পৌছিল সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কিন্তু ধাওড়ার সুমুখে সাঁওতাল কুলিদের মজলিস তখনও ভাঙে নাই। দিনের আলোয় পৃথিবীর বুকের তলায়, অন্ধকার পাতাল-গহ্বরের সুড়ঙ্গপথে সারাদিন ইহারা কয়লা কাটে, তাহার পর রাত্রির অন্ধকারে—দিনের আলো যখন নিভিয়া আসে,—কালিতে-কয়লায়, ঘামে ও ধোঁয়ায় কুশ্রী কদাকার এই কয়লা-কাটার দল তখন একে-একে ধীরে-ধীরে উপরে উঠিতে থাকে,—মদ খায়, গান গায়, আমোদে-আহ্লাদে দিনের পরিশ্রম ভুলিবার চেষ্টা করে। সে হল্লা তাহাদের থামিতে একটুখানি দেরি হয়।

ধাওড়ার চালায় মেয়েদের রান্না চড়িয়াছে।

মুংরা মাঝি ভাল গান গাহিতে পারে। কে-একটা লোক মাদল বাজাইতেছিল।

—বলিহারি এংরাজের কল গো
বলিহারি এংরাজের কল !

অপরে যায় কলের গাড়ি
নামুতে যায় জল গ,
নদীর—নামুতে যায় জল !
হো-হো, 'বলিহারি এংরাজের ক—ল !"

মুংরা মাথায় হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। উঠানের একপাশে কয়লা-ধরানো আগুন তখনও ধো্ ধো্ করিয়া জ্বলিতেছে।

জোহান্‌কে দেখিবামাত্র মুংরার নাচন্ থামিল; হাত বাড়াইয়া বলিল, "হঁ আয়, তুখেই খুজ্‌ছিলম্। লে—নাচ দেখি একবার, আমি গায়েন করি, আর—আপে দো তুম্‌দাঃ' রুইপে আর তিরিও অরংপে।"—অর্থাৎ তোরা মাদল আর বাঁশী বাজা !

হাঁড়া হইতে মদ ঢালিয়া মাটির ভাঁড়টি জোহানের হাতে দিয়া বলিল, "লে, এগুতে পাউরাটো খেঁয়ে লে।"

'পাউরা' খাইয়া ভাঁড়টি ধীরে-ধীরে হাত হইতে নামাইয়া জোহান্ বলিল, "আমি এসেছিলম তুর কাছ্‌কে একবার ...... সেই ......"

কিন্তু মুংরার তখন বেশ নেশা ধরিয়াছে, সে-কথায় কান দিল না; ঝিমাইতে ঝিমাইতে সবাইকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্, এগুতে আমাদের গায়ের রং ছিল ঠিক্ 'শাকে'র মতন সাদা, সায়েবদের মতন 'এসেল্'।—তা'বাদে হলো কি, একদিন আমরা 'সিং-চাঁদো'র পুজো করতে গেলম্ ভুলে'—বাস্ ! সুয্যি-ঠাকুর গেল রেগে। রেগে বল্লেক কি? না,—আমার পুজো যখন তুরা করলি নাই, তখন তুরা-সব 'কাড়াং কাড়াং ঞুতের' মতন হঁয়ে যা ! বাস্ ! সেই থেকে আমাদের চামড়ার রং হঁয়ে গেল 'হঁদের' মতন—কালি অন্ধকার—শুন্‌লি ? শুন্‌লি সব ?"

হুড়ুম্ মাঝি বলিয়া উঠিল, "হঁ—শুন্‌লম্।"

কিন্তু যে-কাজের জন্য খোঁড়া-জোহান্ কুঠির এতটা অন্ধকার পথ হাঁটিয়া ছাগল খুঁজিতে এখানে আসিয়াছে সে-কথা সে ভুলে নাই। এই সুযোগে পট্ করিয়া মুংরাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাহা-পরব্‌টো কব্‌কে হছেগা তাহ'লে ?"

কথাটা শুনিবামাত্র মুংরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাড়াম্ মাঝির ঘুম পাইতেছিল, হাসির চোটে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। না বুঝিয়াই সেও খানিকটা হাসিল; ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হঁ, তা বেটে।"

মুংরার পাশে বসিয়া লখাই মাদলের উপর তখনও

পর্য্যন্ত টিম্ টিম্ করিয়া চাঁটি মারিতেছিল, হাসি থামিলে মুংরা তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "তা শুনেছিস্, আমাদের জোহানের কপাল্‌টো খুব চয়েন্!"

মাদলওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কেনে, কেনে শুনি?"

"জানিস্ না? জোহানের যে বিয়া দিঁয়ে দিছি।"—বলিয়া মুংরা একবার জোহানের মুখের পানে তাকাইল। খুশীতে ও নেশায় সে তখন মুচ্ কি-মুচ্ কি হাসিতেছে।

লখাই তাহার সুমুখ হইতে মাদলটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমারও একটো দে দিঁয়ে। ইঁ ত' কি বেটে! সে তেবে বিয়াই করি।"

কথাটা মুংরা গ্রাহ্য করিল না; আবার সে ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিতে লাগিল, "বিহা যদি করতে হয় ত' এম্‌নি। যেমন মেইয়া, তেমনি ঘর। জমি আছে, জায়গা আছে, ক্ষেত আছে, খামার আছে। বীরভুঁই জিলায় থাকে। ওই একটো বিটি রেখে বাপ্ গেইছে মরে'—জোহানের সুখ কত হবেক্! খাবেক্-দাবেক্ ফুর্ত্তি করবেক্। না-হবেক খাটুতে, না-হবেক্ কিছু!"

জোহানের বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

হাড়াম্ মাঝির বয়স হইয়াছে, গায়ের রং ঠিক মাটির মত, কোঁচ্‌কানো এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো গায়ের চামড়া—মনে হয় যেন চাষ-দেওয়া ভুঁই। সদ্য ঘুম হইতে জাগিয়া মুংরা মাঝির কথাগুলা সে বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিল, ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিল, "হুঁ—। কিন্তুক্ এই আমি বলে রাখ্ ছি—শুন্!"

এই বলিয়া সে তাহার লম্বা হাতখানি জোহানের কাটা-পায়ের হাঁটুর উপর রাখিয়া বলিল, "বিয়া ত' না-হয় করবি,—অমন মিয়া যখন পেছিস্—ছাড়্ বি কেনে? কিন্তুক্ মিয়া যদি কুলেঁই-গুছেঁই খায়,—তবে ত' জানবি—মাগ্ লয়, জননী। আ—র যদি পাখা ভিজাই জল মারে, তাহেলে ব, 'এই আমি বলে' রাখ্ ছি তুখে,—ঠেঙাই ধুস্‌ধুস্তা 'করে' দিস্, মিয়ার গুষ্টির পিঠা সিজাস্। ঠ্যাঙার চোটে বাঁদর লাচে। বুঝ্ লি?"

জোহান্ সম্মতি জানাইয়া তাহার ঘাড় নাড়িল, "হুঁ হুঁ—ঠিকোই বলেছিস। হুঁ।"

মাদলওয়ালা লখাই-এর তখনও বিবাহ হয় নাই, করিবার ইচ্ছাও আছে। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মুংরার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেনে?—এই খোঁড়াকে ছাড়া আর জাঁওয়াই পেলেক্ নাই উয়ারা? কুথা ঘর বললি?"

মুংরা জবাব দিবার আগেই, জোহান্ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "রাস্তায় আসতে-আসতে দেখি—পল্টু সিং-এর ডিপুর কাছে এই—"

বলিয়া সে তাহার হাত দুইটাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া বলিল,

"এই এত-বড় একটো সাঁপ!"

মাণিক সোড়েঁ ঘুমের ঘোরে মাটিতে একেবারে ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, কাছাকাছি কোথাও সাপ ভাবিয়া চীৎকার করিয়া সে লাফাইয়া উঠিল,

"সাঁপ!"

হাসিতে হাসিতে হাড়াম্ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে 'সাঁপ' এখানে নয়—পল্টু সিং-এর ডিপোর কাছে।

আশ্বস্ত হইয়া মাণিক সোড়েঁ চুপ করিয়া বসিল। বলিল, "গাওনা ত' আর হবেক্ নাই,—উঠ্ ইবারে, চল্!"

গারাং মাঝি মদের হাঁড়িটা নাড়িয়া দেখিতেছিল—তাহাতে আর মদ আছে কিনা।

"কেনে হবেক্ নাই?"

লখাই-এর মাদলটা মুংরা নিজেই তাহার গলায় পরিয়া বাজাইতে বাজাইতে লাফাইয়া উঠিল,

"চিঁদাং চিঁদাং চিঁদাং!
হিয়ো হিয়ো হিয়ো!
সব-চাইতে লাল ফুল্‌টো আমায় পেড়ে দিও
দাদা, আমায় পেড়ে দিও!"

—ডান-ট্যাংটো লটর্-পটর্ বাঁ-ট্যাংটো খোঁড়া
বাবা বভিনাথের ঘোঁড়া
বাবা বভিনাথের ঘোঁড়া !—"

জোহান্ আর সেদিকে ফিরিয়া তাকাইল না, বিড়্ বিড়্ করিয়া কঁদর্য্য ভাষায় তাহাদের গালাগালি দিতে দিতে সে আগাইয়া চলিল। অথচ একটি মাত্র পায়ের জোরে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যায় না।

সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ায় যখন সে গিয়া পৌছিল সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কিন্তু ধাওড়ার সুমুখে সাঁওতাল কুলিদের মজলিস তখনও ভাঙে নাই। দিনের আলোয় পৃথিবীর বুকের তলায়, অন্ধকার পাতাল-গহ্বরের সুড়ঙ্গপথে সারাদিন ইহারা কয়লা কাটে, তাহার পর রাত্রির অন্ধকারে—দিনের আলো যখন নিভিয়া আসে,—কালিতে-কয়লায়, ঘামে ও ধোঁয়ায় কুশ্রী কদাকার এই কয়লা-কাটার দল তখন একে-একে ধীরে-ধীরে উপরে উঠিতে থাকে,—মদ খায়, গান গায়, আমোদে-আহ্লাদে দিনের পরিশ্রম ভুলিবার চেষ্টা করে। সে হল্লা তাহাদের থামিতে একটুখানি দেরি হয়।

ধাওড়ার চালায় মেয়েদের রান্না চড়িয়াছে।

মুংরা মাঝি ভাল গান গাহিতে পারে। কে-একটা লোক মাদল বাজাইতেছিল।

"—বলিহারি এংরাজের কল গো
বলিহারি এংরাজের কল!

অপরে যায় কলের গাড়ি
নামুতে যায় জল গ,
লদীর—নামুতে যায় জল!
হো-হো, বলিহারি এংরাজের ক—ল!"

মুংরা মাথায় হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। উঠানের একপাশে কয়লা-ধরানো আগুন তখনও ধো ধো করিয়া জ্বলিতেছে।

জোহানকে দেখিবামাত্র মুংরার নাচন্ থামিল; হাত বাড়াইয়া বলিল, "হঁ আয়, তুখেই খুজ্ছিলম্। লে—নাচ দেখি একবার, আমি গায়েন করি, আর—আপে দো তুম্দাঃ' রুইপে আর তিরিও অরংপে।"—অর্থাৎ তোরা মাদল আর বাঁশী বাজা!

হাঁড়া হইতে মদ ঢালিয়া মাটির ভাঁড়টি জোহানের হাতে দিয়া বলিল, "লে, এগুতে পাউরাটো খেঁয়ে লে।"

'পাউরা' খাইয়া ভাঁড়টি ধীরে-ধীরে হাত হইতে নামাইয়া জোহান্ বলিল, "আমি এসেছিলম তুর কাছ্কে একবার ······ সেই ······"

কিন্তু মুংরার তখন বেশ নেশা ধরিয়াছে, সে-কথায় কান দিল না; ঝিমাইতে ঝিমাইতে সবাইকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্, এগুতে আমাদের গায়ের রং ছিল ঠিক্ 'শাকে'র মতন সাদা, সায়েবদের মতন 'এসেল্'।—তা'বাদে হলো কি, একদিন আমরা 'সিং-চাঁদো'র পূজো করতে গেলম্ ভুলে'—বাস্! সুয্যি-ঠাকুর গেল রেগে। রেগে বল্লেক কি? না,—আমার পূজো যখন তুরা করলি নাই, তখন তুরা-সব 'কাড়াং কাড়াং এুতের' মতন হঁয়ে যা! বাস্! সেই থেকে আমাদের চামড়ার রং হঁয়ে গেল 'হঁদের' মতন—কালি অন্ধকার—শুন্লি? শুন্লি সব?"

হুড়ুম্ মাঝি বলিয়া উঠিল, "হঁ—শুন্লম্।"

কিন্তু যে-কাজের জন্য খোঁড়া-জোহান্ কুঠির এতটা অন্ধকার পথ হাঁটিয়া ছাগল খুঁজিতে এখানে আসিয়াছে সে-কথা সে ভুলে নাই। এই সুযোগে পট্ করিয়া মুংরাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাহা-পরব্টো কব্কে হছেগা তাহ'লে?"

কথাটা শুনিবামাত্র মুংরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাড়াম্ মাঝির ঘুম পাইতেছিল, হাসির চোটে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। না বুঝিয়াই সেও খানিকটা হাসিল; ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, তা বেটে।"

মুংরার পাশে বসিয়া লখাই মাদলের উপর তখনও

পর্য্যন্ত টিম্ টিম্ করিয়া চাঁটি মারিতেছিল, হাসি থামিলে মুংরা তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "তা শুনেছিস্, আমাদের জোহানের কপাল্টো খুব চয়েন্!"

মাদলওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কেনে, কেনে শুনি?"

"জানিস্ না? জোহানের যে বিয়া দিঁয়ে দিছি।"—বলিয়া মুংরা একবার জোহানের মুখের পানে তাকাইল। খুশীতে ও নেশায় সে তখন মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতেছে।

লখাই তাহার সুমুখ হইতে মাদলটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমারও একটো দে দিঁয়ে। ই ত' কি বেটে! সে তেবে বিয়াই করি।"

কথাটা মুংরা গ্রাহ্য করিল না; আবার সে ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিতে লাগিল, "বিহা যদি করতে হয় ত' এম্‌নি। যেমন মেইয়া, তেমনি ঘর। জমি আছে, জায়গা আছে. ক্ষেত আছে, খামার আছে। বীরভূঁই জিলায় থাকে। ওই এক্টো বিটি রেখে বাপ্ গেইছে মরে'—জোহানের সুখ কত হবেক্! খাবেক্-দাবেক্ ফুর্ত্তি করবেক্। না-হবেক খাটুতে, না-হবেক্ কিছু!"

জোহানের বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল।

হাড়াম্ মাঝির বয়স হইয়াছে, গায়ের রং ঠিক মাটির মত, কোঁচ্‌কানো এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো গায়ের চামড়া—মনে হয় যেন চাষ-দেওয়া ভুঁই। সম্ভ ঘুম হইতে জাগিয়া মুংরা মাঝির কথাগুলা সে বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিল, ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিল, "হুঁ—। কিন্তুক্ এই আমি বলে রাখ্‌ছি—শুন্!"

এই বলিয়া সে তাহার লম্বা হাতখানি জোহানের কাটা-পায়ের হাঁটুর উপর রাখিয়া বলিল, "বিয়া ত' না-হয় করবি,—অমন মিয়া যখন পেছিস্—ছাড়্‌বি কেনে? কিন্তুক্ মিয়া যদি কুলেঁই-গুছেঁই খায়,—তবে ত' জানবি—মাগ্ লয়, জননী। আ—র যদি পাখা ভিজাই জল মারে, তাহেলে ব, 'এই আমি বলে' রাখ্‌ছি তুখে,—ঠেঙাই ধুস্‌ধুস্তা 'করে' দিস্, মিয়ার গুষ্টির পিঠা সিজাস্। ঠ্যাঙার চোটে হাঁদর লাচে। বুঝ্‌লি?"

জোহান্ সম্মতি জানাইয়া তাহার ঘাড় নাড়িল, "হুঁ হুঁ—ঠিকোই বলেছিস। হুঁ।"

মাদলওয়ালা লখাই-এর তখনও বিবাহ হয় নাই, করিবার ইচ্ছাও আছে। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মুংরার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেনে?—এই খোঁড়াকে ছাড়া আর জাঁওয়াই পেলেক্ নাই উয়ারা? কুথা ঘর বললি?"

মুংরা জবাব দিবার আগেই, জোহান্ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "রাস্তায় আসতে-আসতে দেখি—পল্টু সিং-এর ডিপুর কাছে এই—"

বলিয়া সে তাহার হাত দুইটাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া বলিল,

"এই এত-বড় একটো সাঁপ!"

মাণিক সোড়েঁ ঘুমের ঘোরে মাটিতে একেবারে ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, কাছাকাছি কোথাও সাপ ভাবিয়া চীৎকার করিয়া সে লাফাইয়া উঠিল,

"সাঁপ!"

হাসিতে হাসিতে হাড়াম্ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে 'সাঁপ' এখানে নয়—পল্টু সিং-এর ডিপোর কাছে।

আশ্বস্ত হইয়া মাণিক সোড়েঁ চুপ করিয়া বসিল। বলিল, "গাওনা ত' আর হবেক্ নাই,—উঠ্ ইবারে, চল্!"

গারাং মাঝি মদের হাঁড়িটা নাড়িয়া দেখিতেছিল—তাহাতে আর মদ আছে কিনা।

"কেনে হবেক্ নাই?"

লখাই-এর মাদলটা মুংরা নিজেই তাহার গলায় পরিয়া বাজাইতে বাজাইতে লাফাইয়া উঠিল,

"চিঁদাং চিঁদাং চিঁদাং!
হিয়ো হিয়ো হিয়ো!
সব-চাইতে লাল ফুল্টো আমায় পেড়ে দিও
দাদা, আমায় পেড়ে দিও!"

তালে তালে মাদল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে মুংরা বলিল, "বাজা, বাঁশী বাজা!—

—সাঁওতালী মাহালী

পাকা ডেমুর খাওয়ালি

ভা-মুরকে ঝুমুক্ দেখা—লি!"

বাঁশী বাজিল, মদ চলিল,—আবার একটা হৈ-চৈ সুরু হইয়া গেল।

জোহান্ যখন ধাওড়ায় ফিরিল, আকাশে তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

আসিবার আগে সে মুংরাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলে নাই···

"খোড়া-ল্যাংড়া বলে' খিস্যা-তামাসা করছিস নাই ত' 'বায়হা'?"

সিংচাঁদো, দামুন্দর আর মারাং-বুরুর নামে শপথ করিয়া মুংরা বলিয়াছে,—সান্তালী বাপ্ তাহাকে জন্ম দিয়াছে সুতরাং মিথ্যার ধার সে ধারে না।

জোহানের আর ভয় নাই······

বোহান্ যে তাহার এই 'বিহা'র সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টায় আছে সে-কথাও মুংরাকে সে বলিতে ছাড়ে নাই······আর ওই লখাই,—'সুমুন্দি' সব' পারে; মেয়ের ঠিকানাটি উহাকে যেন কোনরকমেই না দেওয়া হয়······

মুংরা বলিয়াছে, "খাতিরজমা।"

···ধাওড়ার চালায় জোহানের লাঠির শব্দ হইতেই ঘরের ভিতর হইতে ছোট ভাই মোহান্ বলিয়া উঠিল, "কেনে গেলি আঁধারে-আঁধারে? ছাগল ত তখন এসেছিল।"

কথাটা যেন সে শুনিতে পায় নাই এইভাবে জোহান্ চুপ করিয়া রহিল।

ঘরের এককোণে কাঁথামুড়ি দিয়া বোহান্ তখন ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কে জানে। বলিল, "হুঃ!" ছাগল খুজ্ তে যেছে। লয় আরও-কিছু কর্ তে···"

কয়লা-কুঠির আবার পরব!

না-আছে ফুল, না-আছে কিছু!

পরব তবু আসে···

সে-বছর আসিল যেন শুধু জোহানের জন্য। ডাঙ্গায়-ডহরে, ঝোপে, ঝাড়ে পলাশের গাছ—যেখানে যত ছিল, পাতা তাহাদের যেন আর দেখাই যায় না,—হাড়ে-গোড়ে ফুল ধরিয়াছে,—রাঙা-রাঙা ডাগর-ডাগর ফুল।

পায়ের খাটুনী জোহানের একটুখানি বেশি পড়িল। মুংরার কাছে দুবেলা যাওয়া-আসা।

হেলিয়া দুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া নানান্ ভঙ্গিতে জোহান্ পথ চলে, ফাঁকা মাঠে গিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজের চলন্ নিজেই ভাল করিয়া দেখে।···দূর হইতে খোঁড়া বলিয়া তাহাকে আর নিশ্চয়ই মনে হয় না!

ঘন-ঘন মুংরার কাছে যাইতে দেখিয়া বোহান্ বলে, "অত—ভাল লয়।"

জোহান্ বলে, "শলা আছে, পরমশ আছে,—বিহা-বলে' কথা!···বিহা ত' হয় নাই,—অতসব তুরা জান্ বি কি করে'?"

ছোট ভাই মোহান্ বলে, "বাইহার আর ভাবনা নাই।"

জোহান্ হাসে।

মোহান্ বলে, "তুর্ ক্ষেতে আমি খাটুবগা চল্। গাড়ী আর ঠেল্ ব-নাই ইখানে।"

জোহান্ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়।

খুশীর চোটে মোহান্ বলিতে থাকে, "চাষ করব—দেখ্ বি, চাউলী, আউর—জাও, আউর—গহম্, ঠিসি, জোণ্ড্ রা—সব হবেক তুর্ মাঠে।··কিসারি, রাহিড়্···"

জোহান্ খুব জোরের সঙ্গে বলে, "হয়—আখুনও হয়। শুনিস্-কেনে মুংরার কাছে!—কিন্তুক্ বিহার কথাটো আখুন্ বলিস্ না কাহুকে।"

ভাই কিন্তু থাকিতে পারে না ; বলিয়া ফেলে।

বাউরীদের যে-সব মেয়ে আম-বাগানের ভিতর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে তাহার সঙ্গে কয়লা-বোঝাই ছোট-ছোট ঠেলা-গাড়িগুলি খাদের মুখ হইতে 'ডিপো' পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যায়—তাহাদের কাহারও আর শুনিতে বাকি নাই।

সুন্দরী শোনে নাই ; সেও আজ শুনিল।

...ইঞ্জিনটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে,—'হেড্-গিয়ার' আর চলে না।—শেষ গাড়িটা মোহানে সুন্দরীতে ঠেলিয়া আনিতেছিল। আম-বাগানের মাঝে আসিয়া মোহান্ হঠাৎ হাত ছাড়িয়া দিল।

সুন্দরী বলিল, "ছাড়লি যে?"

"তা হোক্। গাড়ি উঠতে দেরি আছে। চুটি খাই,—বোস্।"

গাছের একটা শিকড়ের উপর মোহান্ বসিয়া পড়িল।

মুকুলে-আমে বাগানটা একেবারে ভরিয়া আছে।

সুন্দরী বলিল, "আমাকে দুটি আম পেড়ে দে দেখি, খাই আমি।"

মোহান্ বলিল, "উ আম আখুন্ ছুটু।"

"ছুটুই ভাল।"

সুন্দরী আড়চোখে চাহিয়া একবার হাসিয়াই মুখ ফিরাইল।

মোহান্ বলিল, "বিঁয়া কর্‌বি আমাকে?"

সুন্দরী হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুখে আবার কি গুণে বিয়া করবরে থাল্‌ভরা?"

"কেনে? কত কানা-খোড়ার বিয়া হছে—।"

হঠাৎ খাদ-মোয়ানে ওঠা-নামার ঘণ্টা বাজিল। ইঞ্জিন চলিয়াছে।

মোহানের চুটি খাওয়া হইল না। সুন্দরীর কচি আম খাওয়া বন্ধ রহিল।

গাড়ি ঠেলিতে ঠেলিতে মোহান্ বলিল, "আমাদের খাড়া-বাইহাঁর বিহা—।"

"জোহান্-খোড়ার?"

মোহান বলিল, "হঁ ত' কী মনে করেছিস্?"

সুন্দরী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। আড়-চোখে হাসিতে গিয়া আর-একটু হইলেই সে পা হিড়্-কাইয়া লাইনের বাহিরে পড়িয়াছিল আর্-কি! বাঁ-হাত দিয়া মোহান্ তাহার কোমরে ধরিয়া টাল্ সাম্‌লাইয়া লইল।

শনিবার সন্ধ্যারাতে 'বিয়া'।

মুংরা নিজে গিয়া সব ঠিক করিয়া আসিয়াছে।

'বীরভুঁই' জেলার 'ডাঙ্গাল-পাড়া'—অনেক দূরের পথ, দুইটা জঙ্গল পার হইতে হয়, আর একটা নদী।

'ঝুঁঝ্‌কি' রাত থাকিতে তাহারা বাহির হইল। বরযাত্রী পাঁচজন। বোহান, মোহান—দু'ভাই ত' আছেই, মুংরা, হাড়াম্ আর গারাং। সঙ্গে গেল একটা মাদল, একটা বাঁশী আর একটা সিঙ্গা; হলুদ-রঙা ধুতি একটি জোহানের, আর-একটি লাল রঙের গামছা;—ক'নের জন্য ডোম্-ঘরের লাল চওড়া-পেড়ে একখানি শাড়ী। বাঁশের চোঙ্গায় খানিকটা সরষের-তেল বোহান্ তাহার লাঠির ডগায় দড়ি দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়াছিল। পথশ্রমের ক্লান্তির পর ডাঙ্গাল-পাড়ার কাছাকাছি গিয়া হাতে পায়ে ও মুখে তেলটা বেশ করিয়া মাখিয়া লইলেই চলিবে।

খোঁড়া লোক সঙ্গে আছে বলিয়া গারাং মাঝি একটু-খানি জোরে জোরে পথ চলিতেছিল। অনেকখানি পথ আগাইয়া গিয়া সে একবার ফিরিয়া তাকাইল,—জোহান্ তখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। বলিল, "আয় থপ্ করে'—এনেকটো পথ বেটে।"

জোহান্ বলিল, "আ—। ই আর কতটুকুন্! মারে দিলম্-বলে'!"

বোহান বলিল, "মুখে—খুব।"

জবাব দিতে গিয়া জোহান খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া

ফেলিল। পান চিবাইতেছিল, - অনভ্যাসের দরুণ বোধকরি পানের ছিব্‌ড়ে তাহার গলায় লাগিয়া গেছে। কানে একটা মস্তবড় শালপাতার চুটি গোঁজা। লাঠি দুইটা এইবার খুব ঘন-ঘন মাটিতে পড়িতে লাগিল।

লাল-রঙের গামছাটা জোহানের মাথার উপর পাগ্‌ড়ীর মত করিয়া বাঁধা ছিল। তাড়াতাড়ি হাঁটিতে গিয়াই বোধকরি হঠাৎ সেটা খসিয়া পড়িল। মুংরাকে বলিল, "দে ত' বেশ আঁট্ করে' বেঁধে'!"

বাঁধিয়া দিবার জন্য মুংরা দাঁড়াইল।

জোহান্ চুপি-চুপি বলিল, "উয়াকে আন্‌তে হথো নাই।"

"কাথে?"

চোখের ইসারায় বোহান্‌কে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ওই আমাদের মাইতবুটকে। শালা বডা বদ্।"

মুংরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেনে?"

"শুন্‌লিনাই কথার প্যাঁচ্? বলে, 'মুখে—খুব'।"

অজয়-নদী পার হইয়া অবধি তাহারা 'বীরভুঁই'-এর মাটির উপর দিয়া পথ চলিতেছিল।

দূরে কয়েক্‌টা তালগাছের সারির ফাঁকে দিনান্তের সূর্য্য তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমের আকাশ তখন লালে লাল।

গরুর গলার ঘণ্টা বাজিতেছে। রাঙা-মাটির পথের উপর অপর্য্যাপ্ত ধূলা উড়াইয়া কয়েক্‌টা গরুর গাড়ি দূরের শহর হইতে বোধকরি গ্রামে ফিরিতেছিল।

সে-পথ ছাড়িয়া বরযাত্রীর দল ডানদিকে রাস্তা ভাঙিল। সবুজ কচি ঘাসে-ভরা ডাঙার পথ,—দু'ধারে সিঁয়াকুলের ঝোপ। সুমুখে মাঠের ও-পারে প্রকাণ্ড একটা শালের জঙ্গল সুরু হইয়াছে,—কোথায় গিয়া তাহার শেষ, কে জানে!

আর সেই জঙ্গলের পাশে দূরের দুইটা পাহাড়ের উঁচু মাথা দেখা যাইতেছে।

মুংরা বলিল, "উ-ই মারাং-বুরু—!"

বলিবামাত্র তাহারা ছয়জনে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দাঁড়াইয়া পড়িল। লাল আকাশের গায়ে ফিকে-সবুজে আঁকা দূরের সেই দুইটি পর্ব্বত-শৃঙ্গের উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া আবার তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

বনের সবুজ ক্রমশ আরও চিকন্—আরও ঘন হইয়া আসিল।

গাছের ঝরাপাতা ঝাঁট দিয়া জড় করিয়া রাখা হইয়াছে। অদূরে সারিবন্দি কয়েকটি গাছের তলায় খড়ের চাল-দেওয়া ছোট-ছোট মাটির ঘর। ঘর-পঁচিশেক্ সাঁওতালের বস্তি। কয়েকটা কুকুর ও মুর্গী জঙ্গলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মুংরা আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, "ওই ডাঙ্গাল-পাড়া!"

দিনান্তের সূর্য্যরশ্মি গাছের পাতার ফাঁকে মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, বাঁ-হাতটা চোখের উপর আড়াল করিয়া জোহান্ একবার ডাঙ্গাল-পাড়াটা দেখিয়া লইল।

তাহাদের গাছের তলায় বসিতে বলিয়া হাড়াম্ মাঝির হাত হইতে শিঙ্গাটা লইয়া মুংরা তাহাতে ফুঁ দিল। সে কি প্রচণ্ড শব্দ! নিস্তব্ধ বনানীপ্রান্ত যেন কাঁপিয়া উঠিল!

শব্দ শুনিয়া কতকগুলা ছেলে-মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া জাঁওয়াই দেখিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটা কুকুর চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে কন্যাপক্ষের লোকেরাও তখন ঠিক হইয়া ছিল। মাদল ও বাঁশী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে বর-যাত্রীদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহারা বাহির হইয়া আসিল।

"দে পেড়া দেলা পেড়াদে হুড়ুপ্ পে
গাণ্ডো মাচি পেড়া মেনাঃ তা লেয়া
তাং আপেয়ালে পেড়া ঝাডি লোটাতে
ওঁয়ান্ পে পেড়া বেয়াড়্ কাণ্ডা দাঃ !"

—অর্থাৎ হে কুটুম্ব ! তোমরা এসে বস ! আমাদের পিঁড়ি আছে, মাচিয়া আছে। হে কুটুম্ব ! আমরা তোমাদের লোটায় জল দেব। এই ঠাণ্ডা কলসীর জল খাও !

বড়যাত্রীর দলও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। শিঙ্গা ফেলিয়া মুংরা তাহার গলায় মাদল তুলিয়া লইল। জোহান্ হলুদ্-রঙা কাপড় পরিয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া গাছের তলায় বসিয়া রহিল মাত্র, আর-সকলে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল,

"সাজ্ঞিং দিসম্ পচা, সঙ্গে বরিয়াৎ
বহড়্দারে রেপে—ডেরা ফেতলে
দাকা হুতুদ তিমিন্ রেচাং
হুকা তামাকুর এমা লেপে।"

—অর্থাৎ আমরা দূরদেশের বরযাত্রী। শুক্‌নো গাছের তলায় বাসাবাড়ি দিলে। খাবার পরিবেশন করতে দেরি হতে পারে, এখন আমাদের হুঁকো দাও, কল্‌কে দাও !"

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষের গান চলিতে লাগিল। বরযাত্রীর দল এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গান গাহিতে গাহিতে তাহারা ক'নের বাড়ির দিকে রওনা হইল।

" কুচিৎ কুলি হুপারাসিনাতু
লাদাঁকাতে হুপাল্ বালাম্‌ বোলন্
সারজোম্ সাকাম্ হুপল্ কিয়া সিন্দুর
তিমিরেচ্ হুপল্ ওটাব্ আদিং।"

—অর্থাৎ খুব বড় গাঁয়ের রাস্তাটা খুব ছোট, হাঁসি হাঁসি গাঁয়েতে ঢুক্‌ব না। শাল-পাতাতে কেঁয়া-সিন্দুর ছিল, কখন্ সেটা উড়ে' গেছে।"

বিবাহের আয়োজন মন্দ হয় নাই। বড় বড় দুইটা খাসী-ছাগল কাটা হইয়াছিল, হাঁড়িয়া ত' ছিলই ! গ্রামের মধ্যে গোটা-পঞ্চাশেক্ সাঁওতালের বাস, তাও আবার মহুয়া-গাছের ওপারে যাহারা থাকে, তাহারা কেহই আসে নাই। কেন আসিল না কে জানে।

ঘরের উঠানে কচি তালপাতার মণ্ডপ তৈরী হইয়াছিল। বিবাহের যাহা-কিছু করিল, গাঁয়ের মোড়ল বুড়া রাম্‌হাই সোরেন্। তা' ছাড়া আর কে-ই বা করিবে ? মেয়ের ভাই-বোন্ নাই, মা ত' অনেককাল আগেই মরিয়াছে, বাপও এই সেদিন মারা গেল। মেয়ে এখন একা। তবে অবস্থা সবার চেয়ে ভাল। বিঘে-দশেক জমি, গাই, গরু, মুরগী, ছাগল ;—দু'তিন জনের বসিয়া খাওয়া চলে।

খোঁড়া জোহানের কপাল ভাল !

মেয়ে দেখিয়া জোহান্ বলিল, "শাড়ীটো হয়ত' খাটো হবেক্ মুংরা।"

তা খাটো হওয়া বিচিত্র নয়। মেয়ে বেশ ডাগর-ডোগর, বয়স প্রায় কুড়ি-বাইশের কাছাকাছি,—জোয়ান্ মেয়ে।

আহারাদি শেষ হইয়া গেলে কন্যাসম্প্রদানের 'বিস্তি' সুরু হইল।

সুখীকে মানাইয়াছিল ভারি চমৎকার ! মাথায় একমাথা কালো-চুলের খোঁপা, তার-উপর শিরিশের ফুল গোঁজা, পরণে লাল চওড়া-পাড় হলুদ-রঙা শাড়ী। রাম্‌হাই সোরেন্ তাহার হাত ধরিয়া ধীরে-ধীরে মণ্ডপে আনিয়া হাজির করিল।

তালপাতার চাটাইয়ের উপর জোহান্ তাহার বাঁ-পায়ের হাঁটু-অবধি ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

সুখীকে আসিতে দেখিয়া সে তাহার লাঠি দুইটা হাত দিয়া ঠেলিয়া একটুখানি দূরে সরাইয়া দিল।

মুংরা মঝি হাত ঝাড়াইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রামহাই সোরেন্ বলিল "নি বাবা, হড়্ইং সপ্রতাপে কানা।"—অর্থাৎ নাও বাবা, বধূকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি।

সুখীর হাত ধরিয়া তাহাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিয়া মুংরা বলিল, "হেঁ বাবা, আঁম্ কেদালে।"—অর্থাৎ হাঁ বাবা, আমরা পাইলাম।

রাম্হাই সোরেন্ সুখীর পাশে উবু হইয়া বসিল, খুক্ করিয়া কাশিয়া গলাটা তাহার একবার ঝাড়িয়া লইয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল, "আদ কুঢিয়ে কান্, ভেংড়ে কান্, কাঁড়াক্ কান্, লেঢাক্ কান্, গাড়হাক্ সতক্ কান্, আলেয়াঃ এলেকা দ বানুঃ আনা।"

—এখন কুঁড়ে হোক্, দুষ্টু হোক্, কানা হোক্, খোঁড়া হোক্, খারাপ হোক্, হীন হোক্, আমাদের আর এলেকা নাই।

বরপক্ষের সকলেই একবার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বোহানের নেশার মাত্রা একটুখানি বেশি হইয়া পড়িয়াছিল। সে তখন মুংরার পিছনে বসিয়া বড়-বড় তাহার দুইটা আরক্ত চোখের দৃষ্টি দিয়া সুখীকে যেন গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে! ঘাড় নাড়িতে সে ভুলিয়া গেল। ব্যাপারটা কিন্তু জোহানের দৃষ্টি এড়াইল না।

রাম্হাই সোরেন্ একটুখানি থামিয়া আবার বলিতে সুরু করিল, "রাজক কান্, ক' কান্, দেফ্রি কান্, ছিনেরক্ কান্, রানক্ কান্, নঞ্জমক্ কান্, ওড়াক' গুনেক্ হড়কো বেনাওক্ আ—গোড়া গুনেক্ গেই কো বেনাওক্ আ।"

—রাং হোক; তামা হোক, দুষ্টা হোক, ভ্রষ্টা হোক, অবাধ্য হোক,—ঘর-গুণে মানুষ হয়, গোয়াল-গুণে গাই হয়।

সকলেই ঘাড় নাড়িল।

রাম্হাই আবার বলিল, "জাং ইঁ, জাং তরই ইঁ, তরই লে এক্রিং আকাদা, বহঃ মায়াম্ লতুর্ মায়াম্ ইনে দ বালে এক্রিং আকাদা।"

—হাড় হোক, ছাই হোক, আমরা বিক্রি করিয়াছি, কিন্তু মাথার রক্ত কানের রক্ত বিক্রি করি নাই। অর্থাৎ ইহাকে তোমরা খুন-জখম্ করিতে পারিবে না।

"ওনাদলে পাঞ্চায়ে গিয়া, তবে মিং-দিন তারা-দিন দাকা-রঙ্গক্, উতু-রঙ্গক্ সহাওকে লাহাওকেয়া পে। শিখেউ শিখেউতে পাঢ়হাও/ পাঢ়হাওতে বাং গানাক্ খান্, ইন্‌রে মিট্রে হড়্বড়ে কোল্ আলেপে চেপেদাবন্।"

—(খুন-জখম্ করিলে) আমরা প্রতিশোধ লইব তবে একদিন আধদিন ভাত-পোড়া তরকারি-পোড়া সহ্য করাইও। শিখাইয়া পড়াইয়া ভাল না হয়, আমাদের কাছে একজন লোক পাঠাইয়া দিও, আমরা সে-সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ করিব।

রাম্হাই-এর বয়স হইয়াছিল। বুড়া আর রাত জাগিতে পারিবে না বলিয়া 'বিস্তি-কথা' শেষ হইবামাত্র সে তাহার লাঠিটি হাতে লইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল।

সুখী তখনও সেইখানেই মুখ-নীচু করিয়া বসিয়া ছিল। মোড়ল উঠিয়া গেলে সুখীর সমবয়সী কয়েকটা মেয়ে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হৈ-চৈ সুরু করিয়া দিল। একজন তাহার হাতে ধরিয়া পিঁড়ি হইতে টানিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, "উঠ্!"

আর-একজন তাহার গলা জড়াইয়া কানে-কানে কি একটা কথা বলিতেই সুখী মুচ্কি মুচ্কি হাসিতে লাগিল।

তাহার পর সকলে মিলিয়া হাসিয়া হাসিয়া সুর করিয়া গান ধরিল,

"দোড়্ দোড়্ মে তাড়াম্ তাড়াম্ মোড়ল ঘাটরে বা
চৌডাল ডাক্বে
মলম্ মলম্ তেকো সিন্দূর কাটি,
নেলোকান্দ বাবু বোঙা লেকা—।"

—দোড়, দোড়, দৌড়ে যা, চৌদোল আবকির

ডালে আট্‌কে গেছে। কপালে সিন্দুর দেওয়াতে যেন দেবতার মত দেখাচ্ছে!

অনেকক্ষণ হইতেই মুংরাকে কি-একটা কথা বলিবার জন্ম জোহান্ উস্-খুস্ করিতেছিল। এইবার চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "তুর্ সঙ্গে ইয়াদের তবে কি কথা হঁয়েছিল—কি তবে?"

মুংরা বলিল, "কেনে?"

জোহান্ বলিল, "ওই যে তবে বুঢ়া বল্‌লেক্, মেয়েটো যদি দুষ্টু হয়, আমাদের কাছকে লোক পাঠাই দিস্। লোক আবার পাঠাব কোথাকে? আমি ত' এইখানেই রইব।"

বোহানের নেশা ছুটিয়া গেল। বলিল, "রঁইবি কি কত্তে, হেথা আবার রইবি কিস্‌কে? বিয়া কর্‌লি, বেশ কর্‌লি; ইবারে লে মেয়েঁ, নিয়ে—চল্ ঘর্‌কে।"

তাচ্ছিল্যভরে জোহান্ একবার তাহার মুখের পানে আড়্‌চোখে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "হুঁ রে হুঁ,—তুঁই চুপ্ কর্! বিদ্যেটো খুব ভাল তুর্। সব দেখেছি আমি,—সব দেখেছি।"

খুব খানিকটা আস্ফালন করিয়া বোহান্ বলিয়া উঠিল, "কি বিদ্যেটো? কি বিদ্যেটো তুঁই আমার—"

বাকি কথাটা তাহার গলায় আট্‌কাইয়া গেল।

জোহান্ মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "খুব। খুব হঁইছে। খুব বাহাদুর! ভাই না আমার……। চোখ দ্যাখো! ড্যাব্‌রা-ড্যাব্‌রা চোখের আবার চাউনি দ্যাখো—যেমন কি বেটে! দিব আখুনি জলোই দিয়ে ভুঁসে' চোখ্‌কে কানা করে'—।"

হঠাৎ দু' ভাই-এ একটা মারামারি খুনোখুনি ব্যাপার হয় দেখিয়া বুড়া হাড়াম্ মাঝি মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া দিল।

মুংরা বলিল, "কুছু ভাবনা নাই তুর্। কাল থেকে তুঁই এইখানেই থাক্‌বি।"

বিস্তি-কথায় বলিতে হয়, বুড়া রাম্‌হাই সোরেন্ তাই ও-সব কথা বলিয়া গিয়াছে।

ঘাড় নাড়িয়া জোহান্ বলিল, "বেশ।—কিন্তুক্ আমাদের এই মাইতরটোর মতলব ভাল লয়—তা আমি এই আখুন্ থেকেই বলে' রাখ ছি—শুন্।"

"না রে না, হয়—মনে হয়। জুয়ান্ মেয়েঁ দেখ লে অমন্ সবাইকারই মনে হয়।"

এই বলিয়া গারাং মাঝি টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। মণ্ডপের একটা খুঁটিতে-বাঁধা কেরোসিনের মগের আলোয় তাহার কানে-গোঁজা শাল পাতার চুটিটা ধরাইবার জন্ম সেইখান হইতেই সে হাত বাড়াইতেছিল, মোহান্ বলিল, "দে, আমি ধরাই দিই।"

পরদিন বিদায়ের পালা।

সকাল হইতে মদের ছড়াছড়ি। নাচ-গান আর শেষ হয় না!

সুখীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সখীর দল নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে লাগিল,

"গাতে গাতে লাং তাহে কানা
অডি গাতে লাং তাহে কানা
মেং এঁপেল্ হ্ আর্‌সি মেনাঃ
আলাং এঁপেল্ হ বান্ আ।"

—আমরা অনেক্ কাল একজায়গায় ছিলাম,—তোমাকে ঠিক্ নিজের প্রাণের মত ভালবাসি। আমাদের নিজেদের মুখগুলো দেখবার জন্যে না-হয় আর্‌সি আছে, কিন্তু হায়! তোমাকে দেখবার আর আশা নেই।

…… গান কিন্তু তাহারা মিছাই গাহিল। সুখীও গেল না, জাঁওয়াইও গেল না। বিদায় হইল শুধু বরযাত্রী পাঁচজন।

যাবার সময় মুংরা বলিল, "হলো ত' ইবারে? জিউটো বাঁচ্‌লো ত?"

জোহান্ মুখে কোনও কথা বলিতে পারিল না, মাত্র ঈষৎ হাসিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মোহান্ অনেকক্ষণ হইতে বলি-বলি করিয়া এইবার একটা ঢোক্ গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আবার কখন আসব ধ্যয়হা?"

বলিতে বলিতে ডাগর-ডাগর চোখ দুইটা তাহার ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

জোহান্ বলিল, "হঁ আস্বি,—এই আমি ... ... এই ... ... বলে' পাঠাব।"

মোহান্ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

বোহান বলিল, "হঁ, বলে' পাঠাবেক্ উ, তবেই হইছে! দেলা আ!"

জোর করিয়া মোহানের হাতে ধরিয়া সে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

চলিতে চলিতে মোহান্ দু'তিন বার ফিরিয়া তাকাইল।

"আসি তাহ'লে বাইহা?"

জোহানের কাছ হইতে কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

জোহানের দিন বেশ কাটে।

চমৎকার জায়গা!

চোখে-চোখে দেখা হইলেই সুখী একবার ফিক্ করিয়া হাসে ... ...

বয়স হইলে কি হয়,—মেয়েটা ভারি লাজুক।

জোহান্ বলে, "অত লাজ ভাল লয়।"

হাসিতে হাসিতে সুখী সেখান হইতে ছুটিয়া পালায়। খোঁড়া-জোহান্ আর নাগাল পায় না।

জোহানের এখন আর দুই-বগলে দুইটা লাঠির প্রয়োজন হয় না। একটা লাঠিতেই কাজ চলে।

সকালে সেদিন সুখী বলিল, "গাই দুইতে পারিস?"

"কেনে লারব? খুব পারি।"

বড় একটা কাঁশার জাম-বাটি লইয়া জোহান্ গাই দুহিতে গেল। 'ঢেঁকশালে'র পাশেই গাই বাঁধিবার চালা।

অনেক কষ্টে বাছুর বাঁধিয়া, ফেলাইয়া-ছড়াইয়া এক বাটির জায়গায় আধ-বাটি দুধ লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জোহান্ সুখীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরজিবাবু কতক্ষণ আসিয়াছে কে জানে!

কয়েক্দিন হইতে এই বাঙ্গালী-বাবুটি রোজ ঠিক এম্নি সময়ে দুধ লইতে আসে। জঙ্গলের ও-পারে কি-একটা গাঁয়ে তাহার ঘর।

সুখী বলে, "ক'মাস আসে নাই, বাবুর জ্বর হইছিল।"

"তা হোক্।"

সে-কথা জোহান্ মনে-মনেই বলে।

দুধের বাটি লইয়া সুরজিবাবু চলিয়া গেলে সুখী জিজ্ঞাসা করিল,

"কুন্ গাইটো দুইলি?"

জোহান্ বলিল, "ধলাটো।"

সুখী বলিল, "কুঁইলেটো আমি দুইব। ছুটুকি আসবেক্ আখুনি দুধ লিতে।"

ছুটকি বলিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে আর-একটা গাই-এর দুধ লইয়া যায়।

জোহান্ জিজ্ঞাসা করিল, "দুধের দর কত ইখানে?"

সুখী বলিল, "কে জানে! অতসব জানি না।"

"বা—! সুরজিবাবু কত দেয় মাস-কাবার?"

"কিছু দেয় না,—উ অম্নি।"

তাচ্ছিল্যভরে কথাটার উত্তর দিয়া সুখী সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল, জোহান্ বলিল, "আর ইয়ে?—তুর ওই ছুটকি?"

"উ-ও অম্নি।"

অবাক্ হইয়া জোহান্ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল;

"বা—!"

সুখী বলিল, "দুধ কে খায় কে? আমি খাই না।"

"আমি ত' খাই!"

"টুকুছেন্-করে' রাখিস্ তবে কাল থেকে।"

সুখী চলিয়া গেল। জোহানের আর-কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই!

গরু-চরানো, গাই-বাছুরকে খাইতে দেওয়া—এগুলা আবার কাজ!

সুখীর হাতের রান্না জোহানের ভারি ভাল লাগে। বলে, "মিয়াঁ-মানুষের হাতের রান্না খেঁয়েছি সেই কবে—ছুটু-বেলায়; ভুলে' গেইছি।"

খুব বেশি করিয়া ভাত-তরকারি জোহানের পাতের উপর ঢালিয়া দিয়া সুখী বলে, "খা তবে, আবার মনে পড়তে চায়।"

"তাই-বলে' এত-গলা নাকি?"

সুখী হাসিতে হাসিতে বলে, "তা বল্লে শুন্‌ব কেনে? খেতে হবেক্।"

জোহান্ প্রাণপনে সব খাইয়া ফেলে।

বলে, "এম্‌নি করে' খেলে দুদিনেই ফুলে' ঢাক্ হঁয়ে যাব দেখ্‌বি।"

হইলও তাই।

মাস-দুইএর মধ্যেই দেখা গেল, জোহান্ বেশ মোটা-সোটা হইয়া উঠিয়াছে।

বৈশাখ মাস। রোজ বৈকালে আকাশটা অন্ধকার করিয়া আসে, ঝড় ওঠে, কোন-কোনদিন বৃষ্টিও হয়। দূরের রাস্তা হইতে রাঙা-ধূলা উড়াইয়া ঘূর্ণী-বাতাস বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের জাঙ্গাল-পাড়ায় আসিয়া থামে, কখনও-বা লাট্টুর মত পাক্ খাইতে খাইতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া কোথায় চলিয়া যায় কে জানে!

এমনি দিনে সাঁওতালদের মেয়েরা দল বাঁধিয়া বনের ভিতর ঝরা-পাতা কুড়াইতে যায়। শুক্‌নো পাতা বোঝা বাঁধিয়া ঘরে লইয়া আসে। বর্ষার দিনে জ্বালানি কাঠের কাজ চলে।

জোহান্ বলে, "একা-একা তুঁই কি-কত্তে যাস্ সুখী? কই—উয়াদের সঙ্গেও ত' যাস্ না?"

মুখ ভারি করিয়া সুখী বলে, "যাই,—বেশ করি।"

জোহান্ বলে, "কই, পাতা ত' একদিনও আন্‌তে দেখলম্ নাই তুখে?"

সুখী বলে, "তুঁই কি-কত্তে রইছিস্? কাঠ কেটে' দিবি।"

জোহান্ বলে, "না—তুঁই যেতে পাবি নাই।"

সুখী বলে, "আমি যাব। তুর্ কি?"

সুখী আবার যায়।

ঝড় জলের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন বড়-বড় পাথর পড়িতে সুরু হইল।

'ঢেঁক্-শালে'র চালায় বসিয়া জোহান্ জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। সুখী পাতা কুড়াইতে গিয়াছে।

কচি শালের গাছগুলা ঝড়ের ঝাপটে যেন একেবারে নুইয়া পড়িতেছে!

সুমুখে একটা পুকুর। জল যেন ঠিক কাঁচের মত! ঘন ঘন বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগিয়া জলের উপর কুয়াশার মত ফিন্‌কি উড়িতেছে। জমি-সেয়াতের জন্য পা'ড়ে একটা 'টেঁড়া' বসানো হইয়াছে, সেটা বুঝি আজ আর থাকে না!

বাঁশের ঝাড়ে বাতাস লাগিয়া কোথায় যেন বাঁশী বাজিতেছিল।

এমন সময় জোহানের চোখের সুমুখে বৃষ্টির ঘন আবরণ ভেদ করিয়া জঙ্গলের ভিতর হইতে মনে হইল কে যেন ছুটিতে ছুটিতে সেইদিকেই আগাইয়া আসিতেছে।—বোধহয় সুখী।

হাঁ, সুখীই বটে !

ভিজা কাপড় ঝট্‌পট্ করিতে করিতে সে তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আপাদ-মস্তক ভিজা,—মাথার চুলগুলা খুলিয়া গেছে; সুখী হাঁপাইতেছিল।

জোহান্ কি-যেন বলিতে গেল, কিন্তু কথাটা হঠাৎ তাহার মুখেই আট্‌কাইয়া রহিল।

তেমনি আগাগোড়া ভিজিয়া তাহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সুরজিবাবু আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ভিজে' গেলম সুখী।"

জোহান একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

কিন্তু সুরজিবাবু এ সময় কেন? এখন ত' দুধ লইবার সময় নয়……

সেদিন রাত্রে সুখীর সঙ্গে জোহানের ভীষণ ঝগড়া।

এমন প্রায় প্রতি-রাত্রেই হয়, কিন্তু সেদিন যেন একটুখানি বাড়াবাড়ি হইয়া গেল।

সুখীর গায়ের জোর জোহানের চেয়ে ঢের বেশি। খোঁড়া মানুষ,—কোনরকমেই না পারিয়া শেষে সে সুখীর হাতের উপর অন্ধকারেই এক কামড় বসাইয়া দিল।

পরদিন কাহারও মুখে আর কোনও কথা নাই!

জোহান্ আপনমনেই আপনার কাজ করিয়া যায়। সুখীও করে।

সকাল হইতে টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল।

সুরজিবাবু আসিল একটা ছাতা মাথায় দিয়া। দুধ লইয়া সে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ছুটকি আসিয়া দাঁড়াইল,—কোলে একটা ছেলে। ছেলেটাকে নাচাইয়া নাচাইয়া সে গান গাহিতেছিল—

"পানি বর্ষা ঝিপির্ ঝিপির্
বাতাস উড়ে হালায় হালায়—"

সুখী তখন রান্না চড়াইয়াছে। ছুটকিকে দেখিবামাত্র সে রান্না ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; ছেলেটাকে তাহার কোল হইতে যেন ছিনাইয়া লইয়া সেও ঠিক তেমনি করিয়া গাহিতে লাগিল,—

"দেগো আয়ো ছাতা কিনি দে,
দেগো আয়ো গামছা বুনি দে,
হামি আয়ো ঘুগি উড়ি যায়।"

ছেলেটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুখী বলিল, "কুঁইলেট্টোর দুধ তুঁই দুঁয়ে লেগা যা।"

জোহান্ তখন দা লইয়া মাঠের কাছে ছোট একটা গাছের ডাল কাটিতেছিল।

ঢেঁকশালের কাছ হইতে ছুটকি ডাকিল, "ও জাঁও-য়াই, বাছুর ধরবি আয়!"

জোহান্ ফিরিয়া তাকাইল।—মেয়েটা রোজ ওই ছেলেটাকে লইয়া আসে, আর সুখী তাহাকে পাইলে যেন আর ছাড়িতে চায় না।

দুধ লইয়া ছুটকি চালায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সুখীর হাতের দিকে তাহার নজর পড়িল—বাঁহাতের কনুই-এর কাছে ছেঁড়া কাপড় দিয়া কাদার একটা পটি বাঁধা।

"উথানে কি হলো তুর্?"

"কাম্‌ড়াই দিয়েছে থাল্-ভরা।"—বলিয়া চোখের ইসারায় দূরে জোহান্‌কে দেখাইয়া দিয়া সুখী ঈষৎ হাসিল।

কথাটা শুনিবামাত্র তাহার কানে-কানে কি-একটা কথা বলিয়া ছুটকি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুখীও হাসিতে লাগিল।

"আ মর্!"

কিন্তু তাহাদের বাক্যালাপ বেশিক্ষণ বন্ধ রহিল না। সামনের পুকুরে জোহান্ ডুব দিয়া আসিল, ভিজা কাপড়টা ফুইটা বোয়াম্ গাছের ডালে বাঁধিয়া শুকাইতে দিয়া সুখীকে বলিল,

"দে ভাত দে!"

সুখী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,

"দিছি,—বোস্।"

...দিনকতক্ পরে ছুটকি যে ছেলেটাকে রোজ কোলে করিয়া লইয়া আসিত, সুখী তাহাকে আর ছাড়িল না, বলিল,

"ছেলেটা থাক্ আমার কাছে।"

ছুটকিকে এতটুকু আপত্তি করিতে দেখা গেল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, "থাক্।"

সেইদিন হইতে ছেলেটাকে লইয়া সুখী যেন একেবারে মাতিয়া উঠিল। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে যেন আর তাহার অবসরই থাকে না।

জোহান্ বলে, "বাবা:! পরের ছেলে—এত কেনে?"

হাসিতে হাসিতে সুখী বলে, "পরের ছেলে কেনে হবেক্? আমার ছেলে।"

জোহানও ঈষৎ হাসিয়া বলে, "ধেৎ!"

সুখী আবার হাসে, বলে, "মন্‌কে লিছে নাই, লয়? কিন্তক্ সত্যি বলছি আমি।"

"যাঃ—!"

বলিয়া জোহান্ কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু তাহার ভাল লাগে না।

মাঝে-মাঝে ছেলেটার মুখের পানে সে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকায়,—আর তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন রী-রী করিয়া ওঠে...

সেদিন এই ছেলেটাকে লইয়া আবার এক-পশলা ঝগড়া হইয়া গেল।

দুধ লইতে আসিয়া সুরজিবাবু সেদিন এই ছেলেটাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিল।...বাঙ্গালী বাবু—সাঁও-তালের ছেলেকে কোলে লইয়া আবার আদর করিয়াছে কবে? আদর করুক্, কিন্তু মুখে-মুখে 'চুম্' খায় কেন? —আর সে কি একবার?...গোয়ালের কাছে সুখী স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, হাসিল,—অথচ মুখে কিছু বলিল না।

—এই লইয়া ঝগড়া।

অনেকক্ষণ হইতেই কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল।

জোহান্ বলিল, "ইদিকে ত' লাজের নাই সীমে,—আর ইদিকে খুব!"

জবাব না দিয়া সুখী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

জোহান্ আবার বলিল, "কেনে চুম্ খাবেক্? চুম্ কি খেলেই হলো!"

সুখী বলিল, "খাবেক্, বেশ করবেক্।"

"কেনে,—উ তুর্ কে বেটে কে?"

মুখ ফিরাইয়া সুখীও পাল্টা গাহিল, "কেনে, তুই আমার কে বেটিস্ কে?"

স্ত্রীর মুখে এত বড় কথা জোহানের সহ্য হইল না।

হাতের লাঠিটা তুলিয়া বলিল, "দেখেছিস্ ঠেঙা? কে বেটি আখুনি বুজোঁই দিব।"

সুখী বলিল, "ও মা আমার কে রে! এত আমাকে ভালবাসে!"

লাঠিটা ধীরে-ধীরে হাত হইতে নামাইয়া জোহান্ বলিল, "না—বাসি না?"

"হুঁ—বাসিস্!"

"দেখ্‌বি?"

"দেখেছি।"

ঢেঁকশালে বসিয়া কথা হইতেছিল।

"দেখ্‌বি তবে?"

বলিয়া সুমুখের ঢেঁকির উপর জোহান্ তাহার মাথাটা ঠাই ঠাই করিয়া জোরে-জোরে ঠুকিতে লাগিল।

"ও মা গ,—ই কি জ্বালা গ, ই কি ফেসাদ্ গ!"

সুখী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

জোহানের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলা তখন মুখের উপর,

ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! কপালের খানিকটা জায়গা ফুলিয়া দর্ দর্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল!

সুখী ধীরে-ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

"মর্ যা-বুঝি, তাই কর্। আমার চোখের-ছামুতে কেনে?..."

জোহানও উঠিল। বগলে লাঠি লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চালা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, "রইব নাই ইখানে আর! চল্লম। ভিক্ মেগে খাব—সেও ভাল।"

জোহান্ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মহুয়া গাছের তলা দিয়া সুমুখে ডাঙার রাস্তা ধরিল।

"মর্গা যা!"—বলিয়া সুখী একবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র।

মধ্যাহ্নের সূর্য্য তখন মাথার উপর প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু বেলা গড়াইতে না গড়াইতেই দেখা গেল, দূরের পাল হইতে গাই-বাছুরগুলাকে ডাকাইয়া তাহাদের পিছু-পিছু টুক্-টুক্ করিতে করিতে জোহান্ আবার ডাঙাল-পাড়ার দিকেই ফিরিয়া আসিতেছে।

গরুগুলা বাঁধিয়া জোহান্ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সুখী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ফিরে' এলি যে?"

কোনও কথা না বলিয়া জোহান্ ধীরে-ধীরে চালার উপর উঠিয়া বসিল। মুখখানা শুক্নো, পায়ে একহাঁটু ধুলা উঠিয়াছে, রক্তের দাগটা শুকাইয়া গেছে, কিন্তু কপালের ফুলাটা তখনও কমে নাই।

সুখী বলিল, "ভাত খা, ভাত রইছে কখন্-থেকে তার ঠিক নাই।"

জোহান্ এবারেও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ভাতের থালাটা তাহার সুমুখে নামাইয়া দিবামাত্র, ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন করিয়া খায়, জোহানও ঠিক তেমনি করিয়াই নিমেষের মধ্যেই থালাটা শেষ করিয়া ফেলিল।

তাহার পর হামেসাই এমনি হইতে থাকে।

একদিন যায়—দুদিন যায়, আবার কোনও ছুতা পাইলেই জোহান ঝগড়া করে, রাগ করিয়া চলিয়া যায় বলে, "আর আস্ছি-নাই বাবা!"

কিন্তু খাবার সময় হইলেই আবার ফিরিয়া আসে। কোনওদিন একবেলা খায় না,—কোনদিন-বা দুই বেলাই খায়।

সুখী বলে, "যাবি কুথা?"

জোহান বলে, "ঠিক যাব—তুঁই দেখে' লিস্।"

কিন্তু যায় না। যেমন দিনকতক ফুলিয়া উঠিয়াছিল, দেখিতে-দেখিতে আবার তেমনি শুকাইয়া সরু হইয়া যাইতে লাগিল।

রাগ করিয়া ফিরিবার পথে বনের পাশে হঠাৎ সেদিন তাহার সুবৃজিবাবুর সঙ্গে দেখা।

জোহান ডাকিল, "এই বাবু, শুন্!"

সুবৃজিবাবু থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

জোহান বলিল, "কুথা যেছিস্ কুথা?"

ডাঙাল-পাড়ার পথেই সে চলিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দূরের একটা গাঁ দেখাইয়া দিয়া বলিল, "হোই—ওই গাঁটোতে যেছি। কেনে?"

জোহান বলিল, "দুধ লিতে আর যাস্ না তুঁই, দুধ আর দেয়া হবেক নাই তুখে।"

"বেশ।"

আর-কিছুই সে বলিতে পারিল না। ডাঙাল-পাড়ার

পথ ছাড়িয়া, মাঠের দিকে পথ ভাঙিয়া সুরজিবাবু সেই দূরের গ্রামটার দিকেই চলিতে লাগিল।

"আর, হা—শুন্! ভাল্!"

সুরজিবাবু আবার ফিরিয়া তাকাইল।

"খারাপি হঁয়ে যাবেক্ কুন্‌দিন তাহ'লে। শুন্‌লি?"

কথাটা শুনিয়া সুরজিবাবু পিছন ফিরিয়া একটুখানি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে সুরজিবাবুকে আর দুধ লইতে আসিতে দেখা গেল না।

জোহান্ আর সেদিন রাগ করিয়া কোথাও যায় নাই। মাঠের ধারে বসিয়া গাই-বাছুরের জন্য সমস্তদিন ঘাস চাঁচিয়াছে।

সন্ধ্যায় ঘাসের বোঝা লইয়া সে ঘরে ফিরিতেছিল, সুখী বলিল, "কি বলেছিস্ সুরজিবাবুকে?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জোহান্ বলিল, "বেশ করেছি—বলেছি।"

"বেশ করবি কি রকম?"

ঘরের দিকে চলিতে চলিতে জোহান বলিল, "দিব শালার কুন্‌দিন মাথাটো ফুটোই! দেখে-লিস্ তুঁই!"

"দিলেই হ'ল কি-না! উ তুর্ কি কল্লেক্?"

সুখীর মুখের দিকে একবার গর্জ্জিয়া তাকাইয়া জোহান্ বলিল, "কি করলেক্? আধুনও বল্‌ছে কি কল্লেক্? চুয়াড় হারামজাদী!"

গাল খাইয়া সুখীর রাগ চাপিয়া গেল। বলিল, "মুখ সামলে কথা,ক' বল্‌ছি খোড়া-কোথাকার! ভারি আমার বিয়ে-করা হঁয়ে···না আমার—"

ঘাসের বোঝাটা মাথা হইতে ধড়াস্ করিয়া সেই খানেই ফেলিয়া দিয়া জোহান্ বলিল, "হেয়্ লে তবে! উয়াকে নিয়েই থাক্।"

"থাকবই ত'!"

সারাদিনের পর জোহান্ আজ এতক্ষণে রাগ করিয়া পিছন ফিরিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার সে মাঠের পথ ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

"আর আস্‌ছি নাই।"

"আসিস্ ত' তুখে দিব্যি রইল।"

আসিল না। সমস্ত রাত্রির মধ্যে জোহানের আর দেখা নাই! কোথায় গেল,—কোথায় রহিল কে জানে!

কোথাও যায় নাই···

পরদিন অতি-প্রত্যুষে ঘরের কাছে ভয়ানক একটা হৈ-চৈ গোলমালে সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুমুখের সেই পুকুরটার পাড়ে ভাঙাল-পাড়ার অনেক সাঁওতাল আসিয়া জড় হইয়াছে। জোহান-খোঁড়া কাল রাত্রে কখন্ নাকি ওই পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

ঘুমন্ত ছেলেটাকে ঘরে ফেলিয়া সুখী সেইখানে ছুটিয়া গেল।

জল হইতে টানিয়া টানিয়া খোঁড়াকে তখন ডাঙায় তোলা হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে আর চেনা যায় না। চোখদুটা তাহার মাছে খুব্‌লাইয়া গর্ত্ত করিয়া দিয়াছে, জল খাইয়া পেটটা ফুলিয়া ঢাক্ হইয়া গেছে। হাতের লাঠিটা তাহার ভাসিয়া ভাসিয়া বাঁশ-ঝোপের কাছে গিয়া লাগিয়াছিল।

বুড়া রায়্‌হাই সোরেন্ ঘাটের কাছে হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে সুখীকে হঠাৎ দেখিতে পাইল। বলিল, "কি হঁয়েছিল বল্ দেখি?"

সুখী একদৃষ্টে সেই বিকৃত মৃতদেহটার দিকে তাকাইয়া রহিল। জবাব দিল না।

রায়্‌হাই বলিল, "উটোকে পুড়োঁই দিয়ে আসুক্,—কি-আর হবেক্! মুংরা মাঝিকে একটো খবর দিয়ে পাঠাই।"

"খুব করেছিস্ তুঁই, আর তুখে খবর দিতে হবেক্ নাই।" বলিয়া সুখী তাড়াতাড়ি তাহার ঘরে চলিয়া গেল। কয়েকটা উৎসুক ছেলে-মেয়ে তাহার পিছনে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে তখন তাহার ঢেঁকশালের চালায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে।

বন্দিনী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মুক্তির পিপাসা বহি'
পিঞ্জরের অনর্গল দ্বারে,
অনন্ত-প্রশান্ত নীলে
মেলিয়া নয়ন
কারে সখি,
চাহ বারে-বারে?

কে তোমার হৃদয়ের
স্নিগ্ধ-সরোবরে
আপনার ছায়া
বিস্তারিয়া
নভে-নভে চলে যায়
সুখে সন্তরিয়া
বিহঙ্গ-চঞ্চল?
অসিত সায়র-নীরে
মেলি' শত পাখা,
লীলাভরে খেলা করে
শ্বেত শতদল!

হেথা বর্ষ হ'য়ে
এলো শেষ;
হের, উদয়-অচলে
ফুটে উঠে জীবনের
অনাগত
নবীন কাহিনী;

ধরণীর বুকভরা
প্রীতি-কুঞ্জবনে
বাসর রচনা করে
আশার দুকুল-ভরি'
স্বপন-চাহনি!
হেথা পিক,
কিংশুকের বনে,
রক্ত-আঁখি,
রক্তিম-ব্যথায়
ঐ শোন,
করে হায়, হায়!
তোমার নয়ন-দুটি
করি' অবনত,
চাহ একবার,
এ ধরণী,—এ অরণ্য-বীথি
শ্যামলের প্রাণময়
খেলা,—
রহিবে একেলা?
এরা কি আত্মীয় নয়,
নহেক তোমার?

হের, ঐ নগ্ন গিরি-মূলে
ভগ্ন-মনোরথ,

কর্ম্মের নির্ম্মম চক্রে
চূর্ণ করি প্রাণ,
তারি খণ্ড যত,
মধুর-উত্তপ্ত,
করপুট পরিপূর্ণ করি',
অনায়াসে
করিতেছে দান!
অন্ধকার কন্দরের মাঝে
হয়তো লুকান আছে—
অমলিন স্মৃতি,
ব্যর্থ জীবনের কত,
সত্য-অনুভূতি,
হৃদয়ের বহু ব্যথা-স্রাবী!
তোমা পরে,
একেবারে
সে ভাগ্যহীনের
নাই, নাই,
নাহি কোন দাবি?

শুধু নীল আকাশের
ফেণাবিল দুরন্ত সাগরে
চলন্ত বলাকা,
তোমার নয়ন-মন
করিবে হরণ,—
বাসনার তুলি দিয়ে
আঁকা,
কামনার কল্প-লোকে
চিত্রিত অলকা?

মুক্তির আনন্দ-নীড়ে
হৃদয়ের সত্যতম
ক্ষুধা,
অতৃপ্ত নিদ্রার ঘোরে
স্বপ্নে করে পান,
অনাগত জীবনের পাত্র
পূর্ণ করি'
সঞ্জীবনী সুধা!
তাহার
আহ্বান-লিপি
নিত্য জ্যোতির্ম্ময়—নিশীথের
নক্ষত্র-অক্ষরে,
তাহার আহ্বান গান
নিতি-কল্লোলিত
উর্ম্মি-ভাঙা সমুদ্রের
সফেণ অন্তরে!

তোমার নয়নে হেরি
সে জ্যোতির গুটি-কয় রেখা—
কবি কম্পমান,
সে গানের ব্যথাতুর
নিবিড় মূর্চ্ছনা,
নীরব করিয়া দেয়
জীবনের যত-কিছু
ব্যর্থ-বিড়ম্বনা
অনর্থক গান!

ছাপার ভুল

দুই হাস্নুহন—তিরিশের পাতার প্রথম কলমের একুশ লাইনের—"পৃথিবীর বলতে যা-কিছু সবেতেই তুমারী স্পর্শ......" ইত্যাদি থেকে একটি নতুন প্যারা আরম্ভ হবে।

মানুষের মানে চাই

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে!
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হায়রাণ হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে,—
নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না!
এই নিখিল-রচনার অর্থ মানুষের অর্থকে আশ্রয় করে' আছে যে—
তাই, তোমারও মানে চাই আর আমার—।
দূর নীহারিকায় নব নক্ষত্র যে জন্মলাভ করছে সেই অর্থের ভরসায়!

সে অর্থ কি মাটিতে লুটিয়ে চলে—?
মানুষের মানে কি কাফ্রী-ক্রীতদাস?
—হারেমের খোজা?
'মানুষের মুখ চেয়ে যে পৃথিবীর এই অক্লান্ত আবর্ত্তন!
তার অর্থ কি হিংস্র নখরাঘাতে সৃষ্টি বিদারণ করে' চলে
রক্ত-লোলুপতার অভিযানে?
মানুষের মানে কি ল্যাংড়া তৈমুর?
—হূণ আত্তিলা?—
মানুষের মানে কি শুধু বুদ্ধ?—শুধু খৃষ্ট?

তবু কাফ্রী-ক্রীতদাসও ত মানুষ—
মানবীর গর্ভ হতেই তৈমুরের জন্ম,
বুদ্ধ খৃষ্ট দেবতা ছিলেন না।

—মানুষের মানে চাই!
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর মোছা চলেছে?

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে।

Brahmo Mission Press, Calcutta.

কালি-কলম

১ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সাল [২য় সংখ্যা

মাধবী প্রলাপ

নজরুল ইস্‌লাম

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি',
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি!

করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি!
ঝুরে আলু-থালু কামিনী
জেগে সারা যামিনী,
মল্লিকা ভামিনী
অভিমানে ভার,
কলি না-ছুঁতেই ফেটে পড়ে কাঁঠালি-চাঁপার!

ছি ছি বেহায়া কি সাঁওতালী মহুয়া ছুঁড়ি,
লাজে আঁখি নীচু করে' থাকে সোঁদাল-কুঁড়ি।
  পাশে লাজ-বাস বিসরি'
    জামরুলী কিশোরী
    শাখা-দোলে কি করি'
      খায় হিন্দোল।
হ'ল ঘাম-ভাঙা লাজে কাম-রাঙার কপোল!

বাঁকা পলাশ-মুকুলে কার আনত আঁখি?
ওগো রাঙা-বৌ বনবধূ রাগিল নাকি?
  তার আঁখে হানি কুঙ্কুম
    ভাঙিল কি কাঁচা ঘুম?
    চুমু খেয়ে বেমালুম
      পালাল কি চোর?
রাগে অনুরাগে রাঙা হ'ল আঁখি বন-বৌর!

ওগো নার্গিস্‌ফুলী বনবালা-নয়নায়
ওকে সুর্মা মাখায় নীল ভোমরা পাখায়।
  কালো কোয়েলার রূপে ওকি
    উড়িয়া বেড়ায় সখি
    কামিনী-কাজলআঁখি
      কেঁদে বিষাদে?
কার শীর্ণ কপোল কাঁদে অস্ত-চাঁদে।

সখি   মদনের বাণ-হানা শব্দ শুনিস্
ঐ   বিষ-মাখা মিশ্-কালো দোয়েলার শিষ!
দেখ্   দুই আঁখি ঝাঁপিয়া
কেঁদে ওঠে পাপিয়া—
'চোখ গেল হা প্রিয়া'
চোখে খেয়ে শর।
কাঁদে   ঘুঘুর পাখায় বন বিরহ-কাতর।

ঝরে   ঝরঝর মরমর বিদায়-পাতা,
ওকি   বিরহিনী বনানীর ছিন্ন খাতা?
ওকি   বসন্তে স্মরি' স্মরি'
সারাটি বছর ধরি
শত অনুযোগ করি
লিখিয়া কত
আজ   লজ্জায় ছিঁড়ে ফেলে লিপি সে যত!

আসে   ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা;
হ'ল   অশোক শিমুলে বন পুষ্প-রজা।
তার   পাংশু চীনাংশুক
হ'ল রাঙা কিংশুক,
উৎসুক উন্মুখ
যৌবন তার
যাচে   লুণ্ঠন-নির্মম দস্যু তাতার!

ওড়ে পিয়াল-কুসুম-ঝরা পরাগ কোমল
ওকি বসন্ত-বনভূমি-রতি-পরিমল ?
ওকি কপোলে কপোল ঘসা
ওড়ে চন্দন খসা ?
বনানী কি করে' গোসা
ছোঁড়ে ফুল-ধূল ?
ওকি এলায়েছে এলো-খোঁপা সোঁদা মাখা চুল ?

নাচে দুলে' দুলে' তরুতলে ছায়া-শবরী,
দোলে নিতম্ব-তটে লটপট কবরী !
দেয় করতালি তালীবন,
গাহে বায়ু শন্ শন্
বনবধূ উচাটন
মদন-পীড়ায়.
তার কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায় !

নভ- অলিন্দে বালেন্দু উদিল কি সই ?
ওযে পলাশ-মুকুল, নব শশিকলা কই ?
ওযে চির-সুষমা ষোড়শী
বিবস্ত্রা উর্ব্বশী,
নখ-ক্ষত ঐ শশী
নভ-উরসে।
ওকি তারকা না চুমো-চিন্ আছে মুর'ছে ?

দূরে শাদা মেঘ ভেসে যায়—শ্বেত সারসী,
ওকি পরীদের তরী, অপ্সরী-আরশী ?
ওকি পাইয়া পীড়ন-জ্বালা
তপ্ত উরসে বালা
শ্বেতচন্দন লালা
করিছে লেপন ?
ওকি পবন খসায় কার নীবি-বন্ধন ?

হেথা পুষ্প-ধনু লেখে লিপি রতিরে
হ'ল লেখনী তাহার লিচু-মুকুল চিরে !
লেখে চম্পা কলির পাতে,
ভোম্‌রা আখর তাতে,
দখিণা হাওয়ার হাতে
দিল সে লেখা।
হেথা "ইউসোফ্‌" কাঁদে, হোথা কাঁদে "জুলেখা" !

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ডিমওয়ালা তাহার মাথার ঝুড়িটি নামাইয়া গণেশ পাঁড়ের দরজায় বসিয়াছিল।

এবং সেই দরজা হইতে একটুখানি দূরে প্রকাণ্ড একটা ফণী-মনসার ঝোপের পাশে গণেশ পাঁড়ের বড় ছেলে চৈতন পাঁড়ে দাঁড়াইয়া আছে। যমের অরুচি চেহারা, অত্যন্ত কালো—কদাকার। কাহার মাঠ হইতে চুরি করিয়া এক বোঝা আধ-পাকা ধান কাটিয়া আনিয়া দরজার উপর অপরিচিত ওই লোকটার ভয়ে বোঝাটা লইয়া সে পার হইতে পারিতেছিল না।

গণেশ পাঁড়ের নজর সর্ব্বপ্রথমে সেইদিকেই পড়িল।

"পেরিয়ে আয় বেটা, পেরিয়ে আয়। আমার ছেলেরে তুই—আমার বেটা।"

সাহস পাইয়া বোঝাটা মাথায় তুলিয়া চৈতন ঘরে ঢুকিল।

"বাহা রে বাহা রে বেটা জোয়ান!—কার মাঠে?"

ঘরের উঠান হইতে চৈতন বলিল, "বাবুদের।"

গণেশ তাহার বাঁ-পাশের গোঁপের ডগাটা পাকাইতে পাকাইতে বলিল, "হুঁ। প্রথমে জমিদার। রুই-কাৎলা আগে,—তারপর চুনোপুঁটি।"

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া সে ডিমওয়ালার দিকে ফিরিয়া কহিল, "কি রে—কি বটেরে তোর?"

ডিমওয়ালা অনেক কষ্টে কাঁদিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হুজুর—"

"বুঝেছি, বুঝেছি,—কত নিয়েছে বল্?"

"আজ্ঞে আনা-চারেক্।"

"ধেৎ বেটা পাজি!"

ডিমওয়ালা চমকিয়া উঠিল।

"আনা-চারেক্ কিরে বেটা,—আনা-চারেক্ কি? টাকা-চারেক্ বল্। তার কম মাম্‌লা চলে না।—দাগ-রাজি? গায়ে দাগ হয়েছে ত?—মারের দাগ?"

"আজ্ঞে না। মিছা কথা বলব কেন, সে সব কিছু—"

ঘরের উঠানে খেজুরের একটা ছাড় পড়িয়া ছিল, গণেশ পাঁড়ে তাড়াতাড়ি সেইটা কুড়াইয়া আনিয়া সপ্ সপ্ করিয়া উপরি-উপরি দু'তিন ছড়ি লোকটার পিঠের উপর বসাইয়া দিল।

যন্ত্রণায় লোকটা চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। "আর এ-গাঁয়ে আসব না বাবু—"

"চোপ্ চোপ্, শালা চোপ্! আস্‌বি না কি,—আস্‌বি না কি? খুব আস্‌বি।" বলিয়া পাঁড়ে তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ঠিক, এই ঠিক দাগ হয়েছে—রক্তমুখী দাগ। বলবি, মেরেছে, উল্টো চারটি টাকাও কেড়ে নিয়েছে।—আচ্ছা, এইবার খরচ কত করতে পারবি বল্?"

লোকটা একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "খরচ আজ্ঞে ক্যাম্‌নে করি—গরীব লোক ডিম বেচে খাই।"

ঘাড় নাড়িয়া পাঁড়ে বলিল, "উঁহুঁ। দশ টাকা আমার, যাতায়াত খরচা বাদে।—আর সাক্ষীর জন্য,—আচ্ছা ওই দশ টাকা।"

ডিমওয়ালা পাঁড়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"আজ্ঞে হুজুর! খরচ আমি কিছুই করতে পারব না।"

পা দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া পাঁড়ে বলিল, "তবে দূর্ হ, দূর্ হ! যাঃ! কপালে তোর মার ছিল—খেয়ে গেলি, বাস্। টাকা না হলে মামলা হয় না।—আচ্ছা, কষ্ট করে' যখন এসেছিস্,—ওরে ও চৎনা, ও চৈতন! কাগজ-পেন্সিল আন্ দেখি, একটা কাগজ-পেন্সিল।"

চৈতন কাগজ-পেন্সিল আনিয়া দিল। কাগজটা দরজার কপাটের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর ভোঁতা একটা পেন্সিল দিয়া চর্ চর্ করিয়া মিনিট-কয়েকের মধ্যেই গণেশ ইংরাজিতে কয়েকটা নাম লিখিয়া ফেলিল।

তাহার পর কাগজটা সুমুখে ধরিয়া বলিল, "এই স নাম লিখে দিলাম। ইংরাজিতেই লিখলাম।

কেনারাম মুকুর্জ্জি—

রাখহরি পাটেক্—

পানকিষ্ট গ্যাঙ্গুলি—

গড়াধর চাটুর্জ্জি—

হরেকিষ্টো টাঁটি—

আর ঘটনাস্থল—পেলেস অভ্ অকুরেন্স হচ্ছে,—সজনী ময়রার দোকান। ধর্—হাত পাত—এই চিরকুট ধর্।"

কাগজের টুকরাটি ডিমওয়ালা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

"বাস্! সোজা চলে যা ইষ্টিশান। সাম্‌নেই থানা। ইন্‌স্পেক্টর বাবুর কাছে দে ঠুকে—এক নম্বর

ডাইরি। এই এই লোকের নাম। বল্‌বি, হুজুর, মেরে'-ধরে' চারটি টাকা কেড়ে' নিলে। মারের দাগ দেখাবি। রক্তমুখী দাগ।"

গণেশ পাঁড়ের দাঁতগুলা হঠাৎ এতজোরে কড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিল যে ঠিক মনে হইল যেন সে ছোলাভাজা চিবাইতেছে। বলিল:

"হায় রে টাকা! টাকা যদি খরচ করতে পারতিস্‌ হতভাগা, ত' দেখিয়ে দিতাম ওই শালা কেনা, আর ওই শালা—। বল্‌বি, সাক্ষী অনেক আছে হুজুর, সবাইকে চিনি না।—আমারও নাম করতে পারিস্‌—গানেশিলাল পাণ্ডে। জি, এল, পাণ্ডে বললেও হয়—জি-এল্‌ পাণ্ডে!"

ডিমওয়ালা বিদেশী মানুষ। ভাই তাহার ষ্টেসনের এক গার্ড-সাহেবের বাবুর্চি এবং খানশামা দুই-ই। ষ্টেসনটি জংসন হইয়াছে। অনেকগুলি সাহেব-সুবার বাস। মুরগীর ডিমের ব্যবসাটা এখানে ভাল চলিবে ভাবিয়া জসিডির 'সিগন্যাল্‌-ম্যানের' কাজে জবাব দিয়া সে এখানে আসিয়াছে। কিন্তু যাহার খাতিরে সে তাহার অমন সাধের 'নোক্‌রি' ছাড়িয়া দিল, এখানে বুঝি সে খাতির আর টেঁকে না। এই ভাবিয়া সে তাহার ডিমের ঝুড়িটি পুনরায় মাথায় লইয়া অত্যন্ত ক্ষুন্নমনে ষ্টেসনের দিকেই চলিয়া যাইতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে গণেশ পাঁড়ে আবার হাঁকিল—

"শোন্‌!"

ডিমওয়ালা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই পাঁড়ে-ঠাকুর নিজেই একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল, "থানা চিনিস্‌? থানা? না চিনিস যদি ত' এক কাজ কর্‌। বরাবর সটান্‌ চলে যা লাইনের ধারে। বাঁ-দিকে বড়-ফটক। সেইখানে যাকে শুধোবি, সেই-ই বলে দেবে—কিশোরী পাঁড়েকে সবাই চেনে।—হেড্‌ চাপ্‌রাশী,—আমারই ছোট ভাই; ফটকে কাজ করে। ইয়া লম্বা-চওড়া জোয়ান্‌—খুঁটিয়াল চেহারা; কাঁধে দেখবি মস্ত একটা চোটের দাগ। তাকে আমার ওই কাগজ দেখাবি, বল্‌বি,—থানার কাজ, আপনার দাদা পাঠালেন। ইংরেজিতে লেখা,—বল্‌বি, কাউকে দিয়ে যেন পড়িয়ে নেয়। বুঝ্‌লি?"

"যে-আজ্ঞে হুজুর।"—বলিয়া ডিমওয়ালা চলিয়া গেল।

পাশেই কামার-পাড়া। পূর্ব্বে নাকি বস্তিটা মন্দ ছিল না। এখন কতক মরিয়া ঝরিয়া গেছে, কতক-বা অন্যত্রে বাস করিতেছে। অবশিষ্ট যে-কয়জন আছে তাহারাই কোন রকমে অত্যন্ত হীন অবস্থায় দিন যাপন করে। রাস্তার ধারে একটি ঘরে এখনও কোনরকমে একটি 'হাপর্‌' মাঝে-মাঝে ফুঁস্‌ ফাঁস্‌ করিয়া চলে, লোহা-পিটানোর ঠুং-ঠাং শব্দ হয়,—এবং সেই শাল-ঘরেরই অর্দ্ধেকটায় হরিপদ কামারের গরু বাঁধা থাকে। ফাল, লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, কুড়ুল, বঁটি—চাষ-বাসের যাবতীয় লোহার সরঞ্জাম হাতের কাছে সবই বাজারে কিনিতে মিলে, কাজেই হরিপদর কাজ-কর্ম্ম এক প্রকার থাকে না বলিলেই হয়,—তবে এই শীতের প্রথমটায় সব কাজ ফেলিয়া তাহার একবার হাপর হাতুড়ি না ধরিলেই চলে না। অগ্রহায়ণে ধান পাকিবে,—পুরানো কাস্তেগুলা একবার শানানো দরকার।

তাই অনেকেই সেদিন তাহার শালে আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

গণেশ পাঁড়ের হাঁক-ডাক শুনিয়া হরিপদর কামার-শালের ভাঙা দরজা হইতে কয়েকজন লোক উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল, বিষণ দে বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে তাহার উপর নজর পড়িতেই পাঁড়ে বলিয়া উঠিল, "ওহে বিষণ, শোন, শোন,—তোমার ছেলেটা সেদিন গাঁজা টানছিল হয়েকেষ্টা তাঁতির সঙ্গে, ভাগ্যে আজ সে ছিল না, তা নইলে এইসঙ্গে ওকেও দিতাম গেঁথে'। যাক্‌, বেটা খুব বেঁচে গেল! তোমার খাতির-টাতির আর থাকবে না বাপু, তাও বলে' রাখছি। লাট্‌-সায়েবের খাতির নাই আমার কাছে!

আমরা জাত কলুজ্যে—আমাদের রাগ ভারি খারাপ।" —এই বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বিষণ তাহার পিছন ধরিল। বলিল, "বুঝ্‌তে পারলাম না পাঁড়ে-ঠাকুর, কি বলছ আপনি ?"

গণেশ কিন্তু তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল না। আপন-মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "সব শালাই সমান, হরেকেষ্টা, রেখো, পেনো, আর ওই কেনা-শালা, ওই যে চোখ মিটির্‌-মিটির্‌! শালা ভারি বজ্জাত। সেদিন বলে কিনা, আমার গরুতে ওর ধান খেয়েছে। হাঁ, খেয়েছেই ত! আচ্ছা করেছে। আর মারবি শালা ডিমওয়ালাকে,—মারবি আর কখনও ?"—বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিয়া বিষণ দের মুখের উপরেই গণেশ পাঁড়ে সদর দরজাটা হড়াম্‌ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

কিন্তু বিষণ দে ইহার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একেবারে অকূল পাথারে পড়িয়া গেল। ছেলেটা না হয় গাঁজাই খায়, কিন্তু পাঁড়ে-ঠাকুরের কোপ দৃষ্টিতে পড়িল কেমন করিয়া ?

হাপর্‌-টানা কাঠের মাথায় লোহার একটা শিকলি ঝুলিত, কিন্তু তাহার অর্দ্ধেকটা হরিপদর বাপের আমলেই ছিঁড়িয়া গেছে। সেই অবধি শিকলির বাকি অর্দ্ধেকটায় কাতার দড়ি দিয়া বাঁধিয়াই কাজ চলিত,—আজ আবার টানিতে টানিতে সেটুকুও ছিঁড়িয়া গেল।

শিকলির ডগায় হরিপদ কাপড়ের একটা ছেঁড়া পাড় দু'-ফের্‌তা করিয়া বাঁধিতেছিল।

বিষণ দে তাহার কাস্তেটি লইবার জন্য পুনরায় কামার-শালে ফিরিয়া আসিল।

শালের ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া ভূষণ নন্দী তখনও উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। বিষণ ফিরিয়া আসিবামাত্র প্রথমেই সে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কি বলে ? বেটা পাঁড়ে কি বল্‌ছে—কী ?"

পাঁড়ের ওই চৈতন বংশধরটির কৃপায় গত বৎসর পুরা একটি বিঘা জমির পাকা ধান ভূষণ তাহার ঘরে আনিতে পায় নাই, কাজেই গণেশ পাঁড়ের উপর তাহার আক্রোশ একটুখানি বেশি হইবারই কথা।

বিষণ বলিল, "কি যে বল্‌লে, আর কি যে কইলে, তা ঐ ঠাকুরই জানে রে ভাই—মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।"

হাপরের দড়িটি বাঁধিতে বাঁধিতে হরিপদ কামার তাহাদের বুঝাইয়া দিল,—"পাশাপাশি ঘর বাবা,—কুমিরের সঙ্গে জলে বাস, আমাদের সব দিকেই নজর রাখতে হয়। তোমাদের ফাল্‌ও শানাই, আবার ও-বেটার দিকেও—।"

এই বলিয়া ভণিতা করিয়া সে যাহা বলিল তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ও-বেটা প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অম্‌নি ফড়র্‌ ফড়র্‌ করে, উহার কথায় কান দিতে গেলে চলে না। কেনারাম মুখুজ্যে, হরেকিষ্টো, রাখ-হরি এবং আরও কয়েকজন মিলিয়া আজ সকালে এক ডিমওয়ালাকে মার্‌-ধোর্‌ করিয়া কয়েকটা টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। গণেশ পাঁড়ে সেই ডিমওয়ালাকে উহাদের নামে নালিশ করিতে পাঠাইল। বিষণ দের ছেলে সেখানে ছিল না, থাকিলে তাহাকেও ঐ সঙ্গে আসামী করিয়া গাঁথিয়া দিত। ইত্যাদি।

একটুখানি থামিয়াই হরিপদ পুনরায় কহিল, "মিছে কথা বলব কেন নন্দী,—চিট্‌ আমার একটুখানি ছিল ওর সঙ্গে। এক পাড়ায় বাস, গুঁতোর চোটে বাবা বলতে হতো! কি জানি বেটা ঘরে আগুন-টাগুনও ত' ধরিয়ে দিতে পারে!"

ভূষণ নন্দী বলিয়া উঠিল, "খুব পারে—খুব পারে, বেটার অসাধ্যি কম্ম নাই।"

হরিপদ বলিল, "চাষের সময় নাঙ্গলের ফাল্‌ শানা-নোর জন্যে এক শলি করে' ধান ত' আমরা সব ঘরেই পাই—সে ত' তোমরা সবাই জান। কিন্তু ও আমাকে কোনদিন এক-চোটাও ঠেকায় না। সেদিন বললাম

ত' বলে কিনা, ঘরের দুয়োরে বাস করে' রয়েছিস্ শালা কামার, ধান কিসের, পায়ের চারটে ধুলো নিয়ে যা।"

বিষণ দে এতক্ষণ ধরিয়া হরিপদ কামারের আগের কথাগুলাই ইস্তাম্ করিতেছিল। এইবার সে তাহার কাস্তেটি হাতে লইয়া উঠিল।

হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "উঠ্‌লে যে?"

বিষণের মুখখানা আগের চেয়ে অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছিল। বুড়ার বয়স হইয়াছে। চোখের উপর ভুরুর চুলগুলা খুব বড় বড়, কতক পাকিয়াছে, কতক্-বা কালো। সেই ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া বিষণ বলিল, "উঠ্‌লাম। হুঁ।"

বলিয়াই সে আবার বসিল। এবং এইবার সে হরিপদর খুব কাছে সরিয়া আসিয়া পেশীবহুল তাহার মোটা-মোটা হাড়ের সে বহু পুরাতন হাত-খানি হরিপদর হাঁটুর উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "তোমার কথাগুলি সব ঠিক্, কিন্তু—তুমি জান না হরিপদ, ছেলেটা আমার বুঝলে কিনা—ভারি বদ্।"

ভূষণ নন্দী বলিল, "গাঁজাও খায়।"

"আ হা হা হা সে ত—" বলিয়া বিষণ তাহার হাত খানি হরিপদর হাঁটু হইতে তুলিয়া ভূষণের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "সে ত' খায়-ই। সে তুমিও জান—আমিও জানি।"

ঘাড় নাড়িয়া নন্দী কহিল, "হাঁ, আমিও ত' তাই বল্‌ছি—খায় ত' খায়—আপনার নিজের পয়সাতেই খায়, তা তোর-বাপের কি রে শালা!" বলিয়া সে তাহার কাস্তে সমেত হাতখানা সেইখান হইতেই গণেশ পাঁড়ের ঘরের দিকে বাড়াইয়া দিল।

বিষণ বলিল, "না না, তা বলো না নন্দী। বামুন,—সে যতই হোক্—দেব্‌তা। তার উপরে বয়সে বড়। তা খাবি ত' খা, পাঁড়ের চোখের সামনে খাওয়ায় তোর কাজ কি? আপনার ঘরে বসে' খা—লুকিয়ে-চুরিয়ে খা। আর—" বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আবার আরম্ভ করিল, "তোর ঘর রইল কোথা, আর তুই 'নিশা' করতে গেলি কোথা—হোই পূব্‌-পাড়ায় হরেকিষ্টো তাঁতির সঙ্গে। আবার শুন্‌ছি, আমার সাত পুরুষে যা কখনও কোথাও নাই—আমার ছেলেটির—" বলিয়া বিষণ তাহার শূন্য হস্তে একটি গেলাসের কল্পনা করিয়া হাতটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ঢুকুঢুকুও চল্‌ছে নাকি আজকাল—।"

"যাই, দেখি আবার! হরেকিষ্টোর কাছেই যাই। কাল আসব, বুঝ্‌লে হরিপদ? কাস্তেটা থাক্।"

হাতের কাস্তেটি হরিপদর কাছে নামাইয়া দিয়া বিষণ দে উঠিল।

কিন্তু ভাঙা দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় সে ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মথন্ বলছে যাত্তার দল করব! তা করুক্। নিশা-ভাং খেয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ভাল। এক-আধ শলি চাল-ধান লাগে, তা আমি বলেছি—লাগুক্, দেব। আর এই গাঁজা, গুলি, আফিং,—এর রেয়াজ্‌টা আজকাল সব-গাঁয়েই। বুঝেছ? কলিকাল আর কাকে বলেছে তবে? সেদিন—অনন্ত নায়েকের সেই গুড্ডিম্ ছেলেটা—দেখি, সেদিন সেও ওই একটা কল্‌কে নিয়ে সটান্ টান্‌ছে। উচ্ছন্ন গেল—সব গেল।"

বলিতে বলিতে বিষণ দে এবার সত্য-সত্যই রাস্তায় গিয়া নামিল।

হরেকৃষ্ণর একা ঘর। গাঁয়ে তাঁতি অনেক আছে, কিন্তু হরেকৃষ্ণর স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন বলিতে কেহ কোথাও নাই। প্রকাণ্ড একটা বস্তির ধ্বংসাবশেষের একটেরে তাহার মাত্র একখানি ঘর কোনরকমে টিঁকিয়া আছে। ঘরখানির মাঝে একটা দেয়াল। এক প্রস্থে নিজে রাঁধে বাড়ে থাকে, আর এক প্রস্থে তাঁত-ঘর। কিন্তু তাঁতটি গত বৎসরের এক দুর্দ্দিনে সে বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে। দিন যে এখন তাহার কেমন করিয়া চলে

তাঁহা সে-ই জানে। তাঁতঘরের গর্ত্তটি এখনও বন্ধ করা হয় নাই। সেই গর্ত্তেরই আশে-পাশে বসিয়া কয়েকজন ছোকরা সকাল-সন্ধ্যা আড্ডা মারে, গল্প করে, তামাক ওড়ায়।

হরেকৃষ্ণ ও রাখহরি দুজনে তখন পাশাপাশি সেইখানে বসিয়া চুপি-চুপি কি যেন পরামর্শ করিতেছিল।

বিষণ দে দরজা হইতে ডাকিল, "হরেকিষ্ট!"

হরেকৃষ্ণ বাহিরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেমন করিয়া কথাটা বলিবে বিষণ দে বুঝিতে পারিতেছিল না, কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "কি রকম যে শুন্‌ছি—"

"কি রকম?"

দে বলিল, "কে নাকি নালিশ কর্‌তে গেল তোমাদের নামে?"

"হুঁ, তাই শুন্‌ছি। ও কিছু না। সেই ডিমওয়ালা ত?"

রাখহরি ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "ডিমওয়ালা আবার কে? ডিম্-টিম্ জানি না আমরা কিছু, যাও বাপু যাও তুমি ঘর যাও।" বলিয়া সে বিষণের হাতে ধরিয়া তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল।

হরেকৃষ্ণও এইবার সেই কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তা বই কি! কে কাকে মেরেছে, কে কার টাকা কেড়ে নিয়েছে, তা আমরা কি জানি?" অমনি মিছামিছি যার-তার একটা নাম করে' দিলেই হলো কি না!"

বিষণ ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আমাদের মথন্ তখন তোমাদের সঙ্গে—" কথাটা সে শেষ করিতে পাইল না।

রাখহরি বলিল, "তাই বল যে নিজের ছেলেটির খোঁজ নিতে এয়েছ। না যাও, তোমার মথন্ ছিল না। মথন্ তোমার লক্ষী ছেলে।"

"তাই এসেছিলাম বাবা, সেই কথাটিই জান্‌তে এসেছিলাম।" বলিয়াই বিষণ পিছন ফিরিল।

বাড়ি ফিরিতেই দেখিল তাহার একমাত্র পুত্র মন্মথ ইহারই মধ্যে স্নান করিয়াছে এবং মাথায় বেশ একটি লম্বা টেরি কাটিয়া নীলরঙের ডোরাকাটা ফতুয়াটি গায়ে দিয়া উঠানের উপর বসিয়া একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়া তাহার চটি জুতা জোড়াটি পরিষ্কার করিতেছে।

বিষণ তাহার কাছে আসিয়া বসিল। বলিল, "হাঁ বাবা মথন্, সত্যি করে' বল্ দেখি বাবা, পাঁড়ে-মহাশয়ের সাক্ষাতে কোনদিন গাঁজাটাঁজা খেয়েছিলি?"

"কে, আমি?" বলিয়া মথন্ তাহার বৃদ্ধ পিতার মুখের পানে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নাঃ।"

বিষণ আশ্বস্ত হইতে পারিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ্ সত্যি করে' বল্ বাবা—"

"নাঃ! মাইরি—না। তোমার দিব্যি করে'—এই ভগবতীর চামড়া ছুঁয়ে বল্‌ছি—তা কেন খেতে যাব?" এই বলিয়া মন্মথ তাহার জুতাজোড়াটি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

এত বড় শপথের উপর আর কথা চলিল না। বুড়া বাপ চুপ করিয়া রহিল।

* * *

বেলা তখন প্রায় দু'পহর গড়াইয়া গেছে।

হৈমন্তিক ধান পাকিবার সময়। গ্রামের পথের উপর, পাকা-ধানের বোঝাই-গাড়িগুলা তখন হামেসাই যাওয়া-আসা করে। পথের ধুলাও উড়ে, শব্দও হয়,—দুপুরটা নিস্তব্ধ প্রায়ই থাকে না।

কিন্তু সেদিন ঠিক এমনি সময়টায় গ্রামের মধ্যে সে এক ভয়ানক গোলমাল উঠিল। গাড়ীর গোলমাল নয়—মানুষে-মানুষে মারামারি-খুনোখুনি গালি-গালাজের বিশ্রী কোলাহল। মনে হইল, শব্দটা যেন দেখিতে দেখিতে পাঁড়ে-পাড়া হইতে ধরম্-তলা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

দূর হইতে ভাল বুঝাও যায় না, অথচ,—পাঁড়ে-পাড়ার গোলমাল। ঘটনাস্থল পর্য্যন্ত আগাইয়া যে কেহ

দেখিয়া আসিবে—এত বড় সাহস কাহারও নাই। যাহাদের আছে, কেহ-বা পড়ো-বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে-ফাঁকে, কেহ-বা গাছের আড়ালে, কেহ-বা পুকুরের পাড় দিয়া খানিকটা আগাইয়া গেল; এবং অনেকেই আপন-আপন দরজায় দাঁড়াইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

এমন গোলমাল এ-গাঁয়ের লোক অনেক শুনিয়াছে।

গণেশ পাঁড়ে বলে, বাংলায় তাহাদের চৌদ্দ পুরুষ বাস করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ বাঙ্গালী নয়, কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছে,—তাহারা কনৌজ্। মারামারি-কাটাকাটি তাহাদের রক্তের মধ্যে। এবং পূর্ব্বপুরুষের সে গৌরবান্বিত রক্তের পরিচয় তাহারা দিতে ছাড়ে না।

গণেশ পাঁড়ের বাপের আমলে তাহাদের খুড়ায়-জ্যেঠায়, আত্মীয়-কুটুম্বে প্রায় আট-দশ ঘর পাঁড়ের বাস ছিল এই গ্রামে। ঝগড়া-বিবাদের সময় লাঠিতে-হাতিয়ারে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানা এক সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িত।

গ্রাম হইতে প্রায় মাইল-খানেক্ দূরে, সরকারি একটা রাস্তার উপর, ছোট একটি নদী বাঁধা পড়িয়াছে। নদীর সেই রেলিং-দেওয়া লোহার সাঁকোটিকে মাঝে রাখিয়া, রাস্তার দু'ধারে বহু পুরাতন প্রকাণ্ড গাছের শ্রেণী শাখায়-পাতায় পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া এম্‌নি ঘন বিন্যস্ত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সোজা চলিয়া গেছে যে, দিনের বেলা রাস্তাটা মনে হয় অন্ধকার—একা চলিতে গা ছম্-ছম্ করে। জায়গাটার নাম ভালুকমারার পুল। এই পুলের কাছাকাছি জংশন-ষ্টেসনের একটি রেলের লাইন পার হইয়াছে,—সেই লাইনের ফটক্‌ওয়ালা ছিল গণেশ পাঁড়ের পিতামহ। গ্রাম হইতে বুড়াকে রোজ সেইখানে যাওয়া-আসা করিতে হইত। অন্ধকার রাত্রে পথযাত্রী অনেক পথিক সেখানে মারা পড়িয়াছে,—এবং এ-সব ছিল নাকি তাহারই কাজ।

গণেশের এক কাকা নাকি ঢিল ছুঁড়িয়া পাখী মারিত। ঢিলের সন্ধান তাহার অব্যর্থ ছিল। রজনী পাঁড়ের গায়ে চোট্ বসিত না।

এ-সব কাহিনী গ্রামের লোক এখনও ভুলে নাই।

মারামারি খাওয়া-খাওয়ি তাহারা চিরকালই করে। কিন্তু সে বৎসর মাত্রাটা যেন একটুখানি বেশিই হইয়া পড়িল।

সেও আজ প্রায় পাঁচ-ছ' বছর পূর্ব্বের কথা।

পাঁড়েদের সকলের ঘরেই তখন অনেকগুলা করিয়া পায়রা থাকিত। গণেশ ও কিশোরী পাঁড়ের ঘরে চাল-ধানের চিরকাল অভাব। অথচ, সুখের পায়রা,—যেখানে খাইতে পায় সেইখানেই চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে গণেশ পাঁড়ের পায়রার 'টোং' ফাঁক্ হইয়া গেল। সে ভাবিল, লোকে বুঝি তাহার পায়রাগুলি মারিয়া মারিয়া খায়।

এই লইয়া তাহাদের ঘরে-ঘরে একটা ঝগড়া বাধে। গণেশ ও কিশোরী একদিকে,—অন্যান্য পাচ-ছ' ঘর পাঁড়ে আর-একদিকে। মুখে-মুখে চলিতে চলিতে হাতাহাতি সুরু হয়। তাহার পর, মাস পাঁচ-ছয় ধরিয়া প্রত্যহই তাহাদের এম্‌নি একটা-না-একটা হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ চলিতে থাকে। উভয় পক্ষই লাঠি-সোঁটা, বঁটি-কুড়ুল লইয়া বাহির হইয়া আসে, দূরে দাঁড়াইয়া গালি-গালাজ করে, ঢিল ছুঁড়ে, দু'-একটা মারপিট হয়,—আবার সব আপন-আপন ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসে। এমনই চলিতেছিল।

হঠাৎ সে-বছর গ্রীষ্মকালের চমৎকার একটি প্রভাত-বেলায় মানুষ তাহার চরম সীমায় গিয়া পৌছিল।

নবোদ্ভাষিত অরুণের স্নিগ্ধ আলোক তখন সবেমাত্র পড়োবাড়ির আগাছার জঙ্গলে,—তাল-তেঁতুলের মাথার উপরে ঝিকিমিকি করিতেছে। আকাশ তেমনি নীল, বাতাস তেমনি স্বচ্ছ···কিন্তু ধরার ধুলা মানুষের রক্তে সেদিন রাঙা হইয়া উঠিল।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উভয় পক্ষই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গণেশ পাঁড়ে কোথা হইতে একটা বহুকালের পুরাতন মুঙ্গেরি গাদা-বন্দুক জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। জন-

তার মধ্যে তাহাই সে সেদিন মরি-বাঁচি করিয়া চালাইয়া দিল।

শীশার ছুরায় মানুষ মরিল না। জন পাঁচ-ছয় জখম্ হইয়া গেল। যাহারা হইল না, তাহাদের মধ্যে একজন ছুটিয়া গিয়া কিশোরী পাঁড়ের হাতের উপর একটা ভোঁতা কুড়ুলের চোট বসাইয়া দিল। কিশোরীর লাঠিতে একটা লোকের মাথা ফাটিল। এমনি করিয়া সেদিন একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

সেদিন আর ইহার মীমাংসা ঘরে বসিয়া হইল না। সরকারি আদালতে ফৌজ্দারি নালিশ রুজু হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বিচার চলিতে লাগিল। আসামী সাক্ষীর এজাহার আর শেষ হয় না। সাহেব হাকিমের মাথার ভিতরটা গোলমাল হইয়া গেল। অবশেষে বছর-দেড়েক ধরিয়া এই এতগুলি লোকের হায়রাণীর পর বিচার শেষ হইল।

এক পক্ষের যৎসামান্য দণ্ড হইল। গণেশ পাঁড়ে দিন পাঁচ-ছয় জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিল। অপরপক্ষ মার খাইয়া বিচার কিনিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া খালাস পাইল।

তাহার পর মোটে ছয়টি বৎসর পার হইয়াছে।

এবং এই ছয় বৎসরের মধ্যে গণেশ-কিশোরী ছাড়া অন্যান্য যে কয় ঘর কনৌজ ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামে ছিল সকলেই প্রায় নির্ব্বংশ হইয়া গেছে। অবশিষ্ট আছে মাত্র কয়েকজন বিধবা। একজন গোপনে গাঁজা-বিক্রির ব্যবসা চালায়। পেটের দায়ে একজন শহরে গিয়াছিল,—কোন্ এক মাড়োয়ারীর জাঁতাকলে গম-পেশার কাজ করিত, এখন সে কি-একটা হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। একটি ঘরে দু'জন ছোকরা আছে। একজনকে ত, যুবক বলিয়া মনেই হয় না, আর-একজনের দিনে দুই বার করিয়া জর আসে, অনবরত তাহাকে লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘরের এক পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। আর একটি ঘর ছিল—গণেশ পাঁড়ের ঘরের প্রায় কাছাকাছি। তাহাদের শেষ বংশধর মতিলাল বহুদিন হইতে কুষ্ঠব্যাধিতে ভুগিতেছিল। গত বৎসর এম্নি দিনে পাল্‌শিটের মিশনারী কুষ্ঠাশ্রম হইতে লোক আসিয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে সেই-খানেই লইয়া গেছে।

তাহারই সেই ফাঁকা-বাড়ির ভাঙা প্রাচীর ডিঙাইয়া, গ্রামের কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক আজিকার সেই পাঁড়ে-পাড়ার গোলমালের রহস্যটা জানিবার জন্য দরজার আশে-পাশে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল।

গণেশ পাঁড়ে সপরিবারে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"ইষ্টিশানের ঘাঁটি আগ্‌লে তুই বসে' থাক্ বেটা চৈতন,—বেটারা পেরোবে আর খবর দিবি। তারপর আমি দেখে নেব।"

এই বলিয়া গণেশ তাহার লোহা-বাঁধানো ছোট লাঠিখানি মাটিতে বারকতক্ ঠক্ ঠক্ করিয়া এ-হাত ও-হাত করিতে লাগিল।

গণেশের জামাতা—সুন্দরসিং চৌবে,—হিন্দুস্থানী কনৌজ্ ব্রাহ্মণ। আরা জেলার কোন্ একটা অখ্যাত-নামা গ্রামে তাহার বাড়ি। মজাফরপুর না কি এম্নি একটা শহরের এলেকার অধীনে কোথায় কোন্ থানায় কনেষ্টবলের কাজ করে। চৌবে-মহাশয় গণেশের কন্যাকে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে মেড়ুয়া-খোট্টার দেশে গণেশ তাহাকে পাঠায় নাই,—মেয়েও যাইতে নারাজ এবং এই কারণে শ্বশুর-জামাতায় কি-একটা মনান্তর হওয়ায় জামাই-বাবাজীর সম্ভবত রাগ হইয়াছে। বৎসরান্তে ছুটি পাইলেই একবার করিয়া অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যও এ-গ্রামে শুভাগমন হইত, কিন্তু গত বছর দুই-তিন তিনি আর আসেন না। স্ত্রী তাঁহার বিরহে দিন-দিন মোটাসোটা হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

পিতার যদি কোন সাহায্যে লাগে ভাবিয়া গণেশের সেই কন্যাটিও দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মা বলিল :

"থাকৃতো আম্‌ার জামাই—সুন্দর! দেখাতো মজা। দু'চারটে মাথা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যেতো।"

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর নামে বিরহিনী ভার্য্যার মুখে হাসি ফুটিল। কিন্তু এই বিপদের দিনে হাসিতে নাই, কাজেই সে তাহার হাসির অর্থটা একটুখানি বদ্‌লাইয়া দিবার নিমিত্ত কাকা-কিশোরীলালের দিকে তাকাইয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিল, "দেখ্‌ মা দেখ্‌ কাকা কেমন—"

কিশোরীলাল তখন ষ্টেসনের ফাটকের কাজে ভাত খাইবার ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিয়াছে। ভাত তখনও তাহার খাওয়া হয় নাই। ব্যাপার দেখিয়া একহাতে একটা টাঙ্গি ও একহাতে একটা কুড়ুল লইয়া ভ্রাতার সাহায্যার্থে সেও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অতিরিক্ত রাগিলে কিশোরীলাল বীরের মত আস্ফালন করিয়া খুব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করিতে থাকে,—মুখ দিয়া তাহার একটিও কথা বাহির হয় না,—ইহাই তাহার স্বভাব। সেদিনও সে তাহাই করিতেছিল।

এমন সময় ধরমতলার দিক হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকটা ঢিল কিশোরীলালের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িতেই তাহার সে আস্ফালন বন্ধ হইয়া গেল।

লোক দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ ঢিল আসে।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কিশোরীলাল একটুখানি তফাতে একটা বট্‌গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইল।

ঢিল দেখিয়া গণেশ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

"ঢিল ছোঁড়ে? লাগাও শালাদের,—মারো মারো শালাদের, ফুটাও, খুন্‌ করে' ফেলে দাও। ফাঁসি-শূলি হয়,—আমি দেখে' নেব, আমি দেখে' নেব, লাগাও—"

বলিতে বলিতে নিজের মেয়ে-ছেলে সামলাইয়া লইয়া গণেশ তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

এদিকে সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মতিলালের পরিত্যক্ত বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া গ্রামের যে-কয়জন ছোকরা হাঙ্গামা দেখিতেছিল, ঢিল দেখিয়া তাহারাও প্রাণপণে ছুটিয়া আপন-আপন্‌ পথ দেখিল।

এবং অনতিবিলম্বেই গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, ধরমতলা এবং পুব্‌-পাড়ার সমস্ত লোকের সঙ্গে পাঁড়েদের দুই ভাইয়ের ঝগড়া বাধিয়াছে, কিন্তু ঝগড়া যে কি লইয়া বাধিয়াছে, কেন বাধিয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ কেহই দিতে পারিল না।

একজন বলিল, "আর একটু থাকলেই জানা যেতো। কিন্তু—"

"যে ঢিল্‌!"

"আর একটুখানি হলেই আমার মাথায়।"

দৌড়িয়া আসিয়া সকলেই তখন হাঁপাইতেছিল।

"বাপ্‌রে বাপ্‌! এ—ত বড়-বড় ঢিল্‌।"

"খুনোখুনি হলো বলে'! শোনই না!"

অনেকেই সেইদিকে কান পাতিয়া রহিল। গরুর-গাড়ির গাড়োয়ানদের বারণ করিয়া দেওয়া হইল। ধান-বোঝাই গাড়ীগুলা তাড়াইয়া তাহারা অন্যপথ দিয়া গ্রামে ঢুকিতে লাগিল।

* * *

ক্রমশ

স্থানচ্যুত

শ্রীঅমিয়া চৌধুরী

১

সহসা একটা ঘটনা শ্রীপতি ও উমাতারার একটানা শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রার ধারা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিয়া গেল।

শ্রীপতির বাড়ীর ভাড়াটেরা সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছিল। শ্রীপতি নূতন ভাড়াটে খুঁজিতেছে, এমন সময় মুঙ্গের হইতে তাহার মামার পত্র পাইল। মামা সেখানকার উকীল। ছোট মেয়েটির বিবাহের পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য কিছুদিন আসিয়া কলিকাতায় থাকিবার ইচ্ছা, শ্রীপতি যেন একখানা ভাল বাড়ী দেখে।

মামার ছেলে বিমল মেসে থাকে, এবং মেডিকেল কলেজে পড়ে। পত্র পাইয়া শ্রীপতি তাহার সহিত দেখা করিল। তাহাকে পত্রখানা দেখাইয়া কহিল, "মিথ্যে বাড়ীর খোঁজ করে' নাকাল হওয়ার দরকার নেই; ভদ্র-লোকের বাসযোগ্য বাড়ী একটা একশ'র কম পাওয়াই যায় না। আমার বাড়ীর উত্তর ভাগটা তো খালিই রয়েচে,—আমি বলি কি মামা এসে এখানেই থাকুন।"

বিমল কহিল, "আচ্ছা, আমি বাবাকে লিখ্‌ছি, আপনিও লিখ্‌বেন। কিন্তু ক'মাস থাকতে হ'বে ঠিক কি! ততদিন আপনি—"

শ্রীপতি কহিল, "ততদিন একজন ভাড়াটে নাও পেতে পারি—, এ দু'মাস তো পড়েই আছে।"

সপ্তাহ মধ্যে উভয় পক্ষের মতামত স্থির হইয়া গেল। শ্রীপতি যখন বাড়ীর উত্তরাংশ পরিষ্কারে মন দিল, তখন উমাতারার মনে হইল স্বামী যেন একটা কাজে ব্যস্ত।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "লোক কেউ আসবে নাকি?" শ্রীপতি বিরক্ত হইয়া কহিল, "লোক কি রকম? আজ রাত্রে মামারা আসচেন যে!"—বিরক্ত হইবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না—তাহা উমাতারা বুঝিয়াও কোন প্রতিবাদ করিল না। সে কহিল, "তাঁদের রান্না করতে হ'বে না?"

"তা হ'বে বৈকি!"

"ক'জন তাঁরা?"

"বামুন চাকর নিয়ে ন'জন। আট জনের রান্না কোরো।"

এমন সময় বিমল আসিয়া উপস্থিত হইল।

উমাতারা মাথার কাপড় টানিয়া দিল। বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "আজকের রান্না—"

শ্রীপতি কহিল, "এইখানেই হ'বে।"

"আজকের রাতটি শুধু; সঙ্গে তাঁদের বামুন আছে। কিন্তু এত রান্না বৌদি পেরে উঠ্‌বেন ত!"

শ্রীপতি বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমাদের যে কথা! পারবে না কেন শুনি! আর কাজই বা কি! তুমিও এইখানে খাবে।"

উমাতারাও বিমলের প্রশ্ন শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল। কিন্তু উত্তরে তার স্বামীর মন্তব্যটা যে একটু কঠোর হইয়াছে একথা তাহার হৃদয় অস্বীকার করিতে পারিল না। সেই রাত্রে সে খুব যত্ন করিয়া রান্না করিল।

মামারা যখন আসিলেন, তখন রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে এগারোটা বাজিয়া গেল। সকলের শেষে বিমল খাইতে আসিল।

ভাত বাড়িয়া দিয়া উমাতারা অদূরে দাঁড়াইয়াছিল; বিমল কহিল, "বৌদি, আপনিও বসুন না, রাত তো কম হয় নি।"

উমাতারা সলজ্জে হাসিল।

ঝি বলিল, "আপনার হোক না দাদাবাবু, মা কি একসঙ্গে খাবেন?"

তখন বিমল যথাসম্ভব শীঘ্র আহার শেষ করিল

এবং উঠিবার সময় কহিল, "এমন রান্না বহুকাল খাইনি, চমৎকার হয়েছে।"

কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া উমাতারা শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার স্বামী ঘুমাইয়া আছেন। সে কাপড় ছাড়িয়া ভাবিতে লাগিল। রান্নার প্রশংসা শুনিয়া তার মন ভরিয়া গিয়াছিল। আজ নয় বৎসর যাবৎ সে স্বামীকে রাঁধিয়া দিতেছে, কোনও দিন কোন প্রশংসা তো তাঁর মুখে শোনা যায় নাই। কেবল রান্না নয়, আজ উমাতারার প্রথম মনে হইল স্বামী তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না। সে কেমন থাকে, কি খায়, কি পরে, কি কাজ করে, কি কাজ জানে, কি বই পড়িতে ভালবাসে, এসব কখনও তাহার স্বামী জিজ্ঞাসা করেন না।

উমাতারার মন উপন্যাসে পঠিত সমস্ত দাম্পত্য জীবনের নজীর টানিয়া আনিল। সেইখানে—সেই কল্পনার রাজ্যে দম্পতি সুখে-দুঃখে তুচ্ছ ব্যাপারেও কেমন একপ্রাণ হইয়া আছে; সে জীবনে কি সজীবতা! উমাতারা মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য বেদনা অনুভব করিল।

জীবনে এই তাহার প্রথম অভাব বোধ।

২

অভাব প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। পাশের মহলেই মামীদের বিলাসপূর্ণ গৃহস্থালী; পাচক, ভৃত্য ও পরিচারিকারা সংসারের সকল কাজ করে। মামী এবং কন্যারা উপন্যাস, বায়স্কোপ, থিয়েটার এবং নিমন্ত্রণের নেশায় মত্ত! মামা সংবাদপত্র ও আলবোলার নল লইয়া নিমগ্ন। বিমল মেস ছাড়িয়া বাসাতেই আছে। ননদদের মধ্যস্থতায় আজকাল বিমলের সহিত উমাতারার একটু সৌহৃদ্য জন্মিতেছিল।

তাহাদের হাসি-খুসী রঙ্গ-কৌতুক দেখিয়া উমাতারা নিজের মনে একটা ভয়ানক শূন্যতা অনুভব করে। তাহার জীবনে এই কৌতুক-রস নাই কেন? উহারা যেন উচ্ছ্বল প্রবাহিনীর মত আপনাদের আনন্দের স্রোতোবেগে আপনারা বহিয়া চলিয়াছে। কিছুই বাধে না, আর সে যেন শুষ্ক জলশূন্য বালুতট।

বিমলের বোন শশীকলার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। সকলে আসন্ন উৎসবের কল্পনায় বিভোর; কেবল উমাতারা তাহার অবসন্ন হৃদয় লইয়া রাস্তার দিকে জানালা খুলিয়া বসিয়া ছিল। এমন সময় নিঃশব্দপদে বিমল কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একখানি কাগজ।

উমাতারার নিঃসঙ্গ মনে একটা আনন্দের সঞ্চার হইল।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বিমল ডাকিল, "বৌদি—"

উমাতারা কহিল, "এসো, বোসো ঠাকুরপো, হাতে ও-খানা কি?"

বিমল বসিয়া কহিল, "হিতৈষী। তুমি তো পড় নিশ্চয়ই"—

কোনদিন পড়ে নাই বটে, কিন্তু সেজন্য উমাতারার মনে কোন দুঃখ হয় নাই। আজ বিমলের এই প্রশ্নে তার মনোরাজ্যে হঠাৎ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য ত! তাহার স্বামীর সম্পাদিত কাগজ সহর শুদ্ধ লোকে পড়ে, সে তো পড়ে না! পড়িবার জন্য কোন কৌতূহল এতদিন তার মনে জাগে নাই কেন? স্বামী কি কখনও একখানা কাগজ আনিয়া তার হাতে দিয়াছেন?

উমাতারা অবাক্ হইয়া রহিল।

বিমলের বুঝিতে বাকী রহিল না। কহিল, "দাদা বুঝি পড়াশুনা ভালবাসেন না! আচ্ছা, তুমি তবে এ কাগজখানা নাও, প্রতি সপ্তাহের কাগজ আমি এনে দেব—"বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার সকালে 'হিতৈষী' উমাতারার হাতে পড়িতে লাগিল। কাগজ পড়িতে পড়িতে উমাতারার বক্ষের ব্যথা প্রবল হইয়া উঠিল। এসব কি নূতন কথা! দেশের কথা, সমাজের

কথা, নারীর অধিকারের কথা, যাহা উমাতারা স্বপ্নেও জানিত না। চারিখানি ইটের দেওয়ালে আবদ্ধ তাহার উদ্দেশ্যহীন, সার্থকতাবিহীন জীবন, তাহার প্রতিদিবসের তুচ্ছ কার্য্যপ্রণালী ও স্বামীর সহিত মাধুর্য্যশূন্য দাম্পত্যসম্বন্ধ তাহার নিজের চোখেই অতি নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইল।

শশীর বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাহার ভগিনীপতি আসিয়াছেন; বড় বোন সুরবালার মুখের দিকে চাহিয়া উমাতারা অবাক্ হইয়া গেল। স্বামী আসিয়াছেন, তাই কি সুরবালার মুখে এমন উজ্জ্বল আনন্দের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে! এতদিন তাহার এমন আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখা যায় নাই! সে সর্ব্বদাই হাসিখুসী বটে, কিন্তু আজ যেন তাহার মুখে একটা জ্যোতি একটা আলো খেলিয়া বেড়াইতেছে। কই, স্বামীকে দেখিলে তাহার মুখে তো এমন প্রেমের মূর্ত্ত আভাস ফুটিয়া পড়ে না! তাহার তো কেবল ভয়ই হয়, অপরাধ করিবার আশঙ্কায় সে সর্ব্বক্ষণ শঙ্কিত হইয়া থাকে। স্বামীর কাছে মন খুলিয়া দুটা কথা কহিবারও তো তাহার সাহস নাই! স্বামী-প্রেমপরিপূর্ণ সুরবালার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া উমাতারা নূতন আঘাত পাইল।

সেইদিন অনেকরাত্রে সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শ্রীপতি আলোর কাছে বসিয়া কি লিখিতেছে। উমাতারা আজ মনে মনে অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া জীবনের গতি সে বদলাইবে। স্নেহ প্রেম সেবা দিয়া সে স্বামীর মনটি আকৃষ্ট করিয়া লইবে। যে অবরুদ্ধ প্রেমের আবেগে তার হৃদয় পূর্ণ, সে তো তাহার স্বামীরই পাওনা। কোন্ সময় কি ঘটে বলা যায় না! বালিকাবয়সে তার বিবাহ হইয়াছিল, বৎসর পাঁচ শাশুড়ী ননদের শাসনে বধূজীবন যাপন করিয়া তারপর সে কলিকাতায় একা স্বামীর সঙ্গে নয় বৎসর কাটাইয়াছে। এই দীর্ঘ চোদ্দবছরের মধ্যে প্রেম তো জীবনে কোথাও ছিল না। উমাতারা জানিত প্রেম কেবল উপন্যাসের উপাদান। অকালে তার উদাসীন চিত্তে যে এই প্রেমের এমন দুঃসহ আবির্ভাব ঘটিবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল?

উমাতারা স্বামীর নিকটে গিয়া বসিয়াই প্রশ্ন করিল, "কি লিখ্‌চো!"

শ্রীপতি খচ্ খচ্ করিয়া কলম চালাইতে লাগিল।

উমাতারার হাতে পানের ডিবা ছিল, সে তাহা স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া দিল। তখন শ্রীপতি কলম রাখিয়া পান চিবাইতে লাগিল। সেই অবসরে উমাতারা তাহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল।

শ্রীপতি অগত্যা কহিল, "ও আমার কাগজের লেখা—তুমি কি বুঝ্‌বে!"

উমাতারা বলিয়া ফেলিল, "কেন, আমি তো বেশ বুঝতে পারি।"

বিদ্রূপের স্বরে শ্রীপতি কহিল, "না পড়েই?"

"আমি তো রোজ পড়ি।"

"পড় ?—পাও কোথা তাই শুনি!"

স্বামীর বিস্ময় দেখিয়া নির্ভীক সত্যকথাটা উমাতারার মুখে বাধিল, সে শুধু কহিল, "ও বাড়ীতে পেয়েছি।"

"বটে।"—বলিয়া শ্রীপতি গম্ভীর হইয়া গেল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া উমাতারা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, আমায় একটু লেখা-পড়া শেখাবে।"

শ্রীপতি হাত বাড়াইয়া হুঁকাটা টানিয়া লইল, এবং একান্ত মনে টান দিতে লাগিল। আগুন প্রায় নিবিয়া গিয়াছিল। উমাতারা জিজ্ঞাসা করিল, "সেজে দেব?" শ্রীপতি কহিল, "থাক্।"—বলিয়া হুঁকাটা নামাইয়া রাখিল। ধূমপানে এতটা অনাসক্তি তার আগে কখনও দেখা যায় নাই। "স্ত্রীশিক্ষা" সম্বন্ধে গত দুই সপ্তাহ যাবৎ 'হিতৈষী'তে যে উৎসাহপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছিল, তাহারই বাকী অংশটুকু সেদিন আর লেখা হইল না। খাতা-পত্র তুলিয়া শ্রীপতি নিঃশব্দে শয়ন করিতে গেল। উমাতারার সমস্ত সংকল্প ব্যর্থ হইল। সে ভাবিল, আমি কি দোষ করিলাম! লেখাপড়া শিখিতে চাহিলাম বলিয়া কি স্বামী রাগ করিলেন! তাঁহাকে রাগাইলাম কেন

সুরবালা হইলে পারিত না। আমি তেমন করিয়া ভালবাসি না বলিয়াই, না বুঝিয়া তাঁহাকে দুঃখ দেই। উমাতারা শয্যায় প্রবেশ করিয়া স্বামীর পায়ের উপর একখানি হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমোলে নাকি!"

অতি নীরসকণ্ঠে শ্রীপতি উত্তর দিল, "কেন!"

"একটা কথার জবাব দেবে?"

"না শুনে কি করে বলব!"

"আচ্ছা জিজ্ঞেস করচি, বলত, আমি পড়াশুনা করলে কি তুমি সুখী হও না?"

শ্রীপতি তিক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মেয়ে-মানুষের বিদ্যেফলানো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে; মেয়েরা রাঁধবে-বাড়বে, ঘরের কাজ করবে; শশী আর সুরোর মত নেচে বেড়ানো শিখ্‌তে চাও?"

উমাতারা তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, বল কি, আমি কেন ঐসব শিখ্‌তে গেলাম! তুমি যা বলবে আমি তাই করব। বেশী পড়াশুনা যদি তুমি পছন্দ না কর, বেশ ত, আমি না হয় আর পড়ব না।"

স্বামীকে সুখী করিবার জন্য নিজের মত বিসর্জ্জন দিয়া উমাতারা সুখবোধ করিল।

৩

সাত আট দিন ধরিয়া শশীর বিবাহের বিপুল উৎসব চলিল। বিবাহের পরদিন শশী ঘোমটা দিয়া নূতন বেশে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। বিবাহের কয়টা দিন উমাতারা যেন এক নব জীবন যাপন করিয়াছিল। তাহার সংসারের কোন কাজ ছিল না। খাওয়া-দাওয়া বিবাহ বাড়ীতেই হইত। উমাতারা কেবল নিজের হৃদয় লইয়া মত্ত হইয়াছিল। বিবাহোৎসবের সকল আনন্দ তাহার অন্তর নববধূর প্রণয়-আভায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল।

চোদ্দ বছর আগে যখন বিবাহ দিবস আসিয়াছিল, তখন উমাতারা নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা। তারপর কোন্ দিন বালিকার দেহে মনে যৌবনোদয় হইয়াছিল সেকথা তো সে বুঝিতেও পারে নাই। সে যেন তখন ঘুমের মধ্যে ছিল। তাহার এই দেহে যৌবনের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছিল; বসন্তের বাতাস, পূর্ণিমার চাঁদ, সন্ধ্যার মাধুরী, মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত আলস্য তাহার জীবনের দ্বারে নিষ্ফল দেখা দিয়া গিয়াছিল; চোখ মেলিয়া কিছুই সে দেখে নাই। কি রিক্ত হৃদয় লইয়া সে চোদ্দ বৎসর কাটাইয়াছে! উমাতারা সেই হারানো দিনের ঐশ্বর্য্য ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় সফল সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একটা আকুল আবেগে তাহার মন ভরিয়া গেল। সে যে কিসের মধ্যে আছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। আপনার আনন্দে ভোর হইয়া রহিল। স্বামীকে সে অত্যন্ত যত্ন আদর করিতে লাগিল। বিবাহের খাটুনী খাটিয়া শ্রীপতি নিজেকে অতিমাত্র শ্রান্ত বোধ করিতেছিল। এই যত্ন ও সেবা পাইয়া সে আরাম অনুভব করিল, কিন্তু অতিরিক্ত আর কিছুই বুঝিল না। যথানিয়মে কাজের অবসানে নাসিকাধ্বনি করিয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল।

শশীবালা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে বাড়ীতে উৎসবের কোলাহল কমিয়া আসিল। শ্রীপতি আবার তাহার সাপ্তাহিক লইয়া ব্যস্ত হইল, এবং উমাতারা তাহার গৃহস্থালীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ভারি আরাম অনুভব করিল। দিনরাত্রি সে নিজেকে তিলমাত্র বিশ্রাম দিল না, একান্তমনে ছোট্ট সংসারটিকে লইয়া পড়িল। আগে যেন বাঁধা নিয়মে দরকারি কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইত। এখন আর সে ভাব রহিল না। সমস্ত কাজেই উমাতারা এক নূতন আনন্দ রস পান করিতে লাগিল।

কয় দিন বিমল বৌদির বড় একটা খোঁজ লইতে পারে নাই। শশী চলিয়া যাওয়ার দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন বিকালবেলা উমাতারা ঘেরা দালানে তোলা উনুন ধরাইয়া সন্ধ্যার জলখাবার প্রস্তুত করিতেছে এমন সময় বিমল আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

বিমলের আগমনে উমাতারা খুসী হইয়া কহিল, ঠাকুরপো যে! এসো। আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।"

"সময় পাইনা যে।"—বলিয়া বিমল আসনের উপর বসিল।

উমাতারা সহাস্য মুখে কহিল, "আজ তোমাকে শীগ্‌গীর উঠ্‌তে দিচ্ছিনে। এই সন্দেশ তৈরী হ'বে, খাবে, তবে যেতে পারবে।"

"তাতে আপত্তি নেই। তারপর—পড়াশুনাটা কি একদম্ ছেড়ে দিলে?"

উমাতারা লজ্জিত হইয়া নীরব রহিল। বিমল কহিল, "দাদা ভালবাসেন না—তাই না?"

সন্দেশগুলি রসে ছাড়িয়া দিয়া উমাতারা হাসিমুখে কহিল, "তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই, মনের কথা টেনে বার করবে।"

বিমল গম্ভীর হইয়া রহিল।

একখানি থালায় সন্দেশ সাজাইয়া উমাতারা বিমলের সামনে ধরিয়া দিল।—"খেয়ে দেখদেখি, কত কষ্ট করে করলুম।"

বিমল সন্দেশ মুখে দিয়া কহিল, "হয়েচে খুব ভালই, কিন্তু আমার জন্যে তো আর করনি বৌদি, যাঁর জন্যে করা তিনি খেয়ে ভাল বল্লেই হয়।"

উমাতারার মুখে নববধূর সরম-রাগ ফুটিয়া উঠিল।

আহারান্তে বিমল আচমন করিলে, উমাতারা পান আনিয়া দিল। বিমল নিঃশব্দে একটার পর একটা পান খাইয়া চলিল, এবং উমাতারার কাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। সেইদিন আর "হিতৈষী" সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতে পারিল না।

৪

ইহার পরদিন সকালবেলা শ্রীপতি আফিসের কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। উমাতারা প্রাতঃস্নান সারিয়া পিঠের উপর শীর্ণ কেশ কয়গাছি মেলিয়া প্রসন্নমুখে শোবার ঘরটি পরিষ্কার করিয়া সাজাইতেছিল। সেইদিন প্রভাতে বর্ষাসজল আকাশে যে সূর্য্যালোক উদিত হইয়াছিল, উমাতারার সদ্যস্নানসরস মুখের উপর যেন তাহার উজ্জল আভাস খেলা করিতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে বিমল ডাকিল, "বৌদি—"

উমাতারা হাসিমুখে কহিল, এসো।"

বিমল বসিয়াই কহিল, "কালকে তো সন্দেশ খাইয়েই বিদেয় দিলে, আর কোনও কথা ত কিছুই হ'ল না।"

"আর কি-কথা ঠাকুরপো?"

"আচ্ছা, সে পরে বল্‌ছি,—আগে বল দাদা কাল সন্দেশ খেয়ে কি বল্লেন?"

উমাতারা বলিল, "বলবেন আবার কি!"

কিন্তু এই সে প্রথম ভাবিল যে কিছুই না বলাটা বাস্তবিক অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য। তাহার মুখের হাসিতে ছায়া পড়িল।

বিমল কহিল, "বৌদি, তোমাদের ধন্য বল্‌তে হয়।"

শুষ্ককণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"এতখানি নিঃস্বার্থ সেবা করা সোজা নয় ত। অথচ যাঁর জন্য করচো, তাঁর তো খেয়ালই নেই; এই যে পড়াশোনা বন্ধ করেছ, এই যে প্রাণপাত করে খাট্‌ছ, একদিন তাঁর কোন ভাবান্তর দেখ্‌লে?"

উমাতারা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কোন প্রতিবাদবাক্য তাহার মুখে বাহির হইল না; বিমল কেমন করিয়া সমস্ত জানিল?

বিমল কহিল, "তোমাকে আর বলব কি! আমাদের দেশের সাড়ে পনরো আনা মেয়ে তো এম্‌নি করেই দিন কাটাচ্চে।"

"তুমি এ-সব কি বল্‌চ ঠাকুরপো?"

"বল্‌চি—আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়—কেন তোমরা তুচ্ছ রাঁধাবাড়া আর তার চেয়েও অর্থহীন এই সেবা-যত্ন নিয়ে ইটের পিঁজরার মধ্যে বাস করচ! এতবড় পৃথিবীতে থাকতে এসেছ কেবল এইটুকু ঘরের ভিতর? আর সমস্ত

প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে খুসী করবে একটি মানুষকে! প্রাণের যে এটা কতবড় অপমান, তা কি বোঝ না?"

উমাতারা বিমলের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমল কহিল, "বৌদি, তোমার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড হৃদয় আছে, সেই হৃদয় তুমি বিশ্বের জন্য উৎসর্গ কর, দেশের জন্য দাও। ভগবান তোমাকে এই পচা গলিতে, এই ইট-কাঠের খোপের ভিতর হৃদয়হীনের দাসত্ব করবার জন্য সৃষ্টি করেন নি।"

—প্রভাতাকাশের সেই প্রসন্ন নির্ম্মল হাস্য নিবিয়া গেল কি? উমাতারার শয়নকক্ষখানি তাহার চোখে নিমেষের মধ্যে কুৎসিত হইয়া উঠিল কেন? এই ঘরের প্রতি তার না বড় মায়া ছিল!

বিমল ডাকিল, "বৌদি—"

যেন সহসা স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া উমাতারা কহিল, "কেন ঠাকুরপো?"

"এই ক'খানা বই তোমার জন্য এনেছিলুম, দিয়ে যাচ্ছি, পড়ে দেখো। সংসারে এসেছ যখন, মানুষের মত থাকা চাই ত। এই বই পড়লে সব বুঝতে পারবে।"

বিমল চলিয়া গেলে উমাতারা বইগুলি লুকাইয়া রাখিল।

আজ আর গৃহকর্ম্মে উৎসাহ রহিল না। শ্রীপতি বাড়ী আসিল; স্নান করিয়া খাইতে বসিল, এবং খাওয়ার পর যথারীতি বিছানায় শুইতে গেল; এর মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে?

উমাতারা ভাবিল, আমি কি নির্ব্বোধ! স্বামীর মন পাইবার জন্য নানা আয়োজন করিয়া, নিজের আনন্দাবেগে ভাসিয়া চলিয়াছি, অথচ মন পাইলাম কি না সে খোঁজ নাই। বিমল না বলিলে তো আমি এই প্রবল ঔদাসীন্য অনুভব করিতেই পারিতাম না! কার জন্য এ-সব করিব, করি-ই বা কেন?

আজ উমাতারার মনে হইল, খুসী করিবার জন্য একপক্ষের এই যে প্রাণপণ প্রয়াস—ইহার মধ্যে একটা মস্ত দীনতা ও আত্মাপমান গোপন আছে। ইহা স্বামী-স্ত্রীর সত্য ধর্ম্মসম্বন্ধ নহে। তারপর একান্তে বসিয়া যখন বইগুলি পড়িল, তখন তার চোখ-মন একেবারে খুলিয়া গেল।

সেদিন সারাটা অপরাহ্ন সে চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিল। সুরবালা একবার আসিয়াছিল, কিন্তু বিমল আসিল না। সুরবালা বলিয়া গেল কলিকাতাবাসী এক জমীদার বাটী হইতে বিমলের বিবাহসম্বন্ধ আসিয়াছে।

কাজ আর ভাল লাগে না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; এখনো উমাতারার সকল কাজ বাকী পড়িয়া। সে কিন্তু আস্তে আস্তে পাশের মহলেই চলিল। বিমল তাহার ঘরে বসিয়া কি করিতেছিল, দূর হইতেই উমা-তারার বিষণ্ণ মুখ ও ক্লান্ত গতি লক্ষ্য করিল, ডাকিয়া কহিল, "বৌদি, আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিয়ে যাও।"

এই সাদর আহ্বান পাইয়া উমাতারা বিমলের ঘরে প্রবেশ করিল।

বিমল কহিল, "বৌদি, বোসো।"

উমাতারা বলিল, "তোমার নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, কথা হচ্ছে।"

"কবে?"

"তা জেনে আমার দরকার কি! আমি তো বিয়ে করব না।"

"কেন?"

"ইচ্ছে হয় না।"

"অমন সবারি হয় না, শেষে আবার সবাই বিয়ে করে। একলা কি সংসারে সুখ হয়?"

বিমল উত্তর দিল, "বিয়ে করলেই যে সুখ হ'বে এমন ভুল ধারণা আমার মনে নেই।"

"বিয়ে করে' সুখী হ'বে না, তা আগে জানলে কি করে?"

"আর পাঁচ জনকে দেখে। সুখী হ'ব কি করে! যুগের কত বদল হয়েচে, মানুষ এখন নিজেকে বুঝতে শিখেছে। নিজের কথাটা সে সকলের আগে ভাবে। এখন সেই নির্ভরতার, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার, দিন নেই।"

উমাতারার নিজমনেই নানা তর্ক উঠিতেছিল, সে তাহারই সূত্র ধরিয়া কহিল, "না হোক্, তবু কেউ কেউ বেশ শান্তিতেই বাস করচে ত'।"

বিমল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাঁরা বোধ করি তোমার কল্পলোকেই বাস করচেন বৌদি—বর্ত্তমান যুগের পৃথিবীতে তাঁরা কোথাও নেই। মেয়েরা চুপ করে' মুখ বুঁজে দিন কাটাচ্চে—সে কেবল নিজেরা অতি অক্ষম বলেই; তারা তো জানে নিজের পেট চালাবার ক্ষমতাও তাদের হাতে নেই; কাজেই পুরুষের বাধ্য হয়ে নত হয়ে থাকতে হচ্চে। বাপ, ভাই, স্বামী, পুত্র—একজন না একজনের অধীন হ'তেই হ'বে। বই-এ যে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের কথা পড়েছ, সে আর কোথায় আছে বৌদি? আমাদের সংসারে যে শান্তি রয়েচে, মেয়েরা যে বিদ্রোহ ঘোষণা করচে না—তার মূলে প্রেম পদার্থটি নেই,—অতি মোটা রকমের একটি কারণ আছে এবং সে হচ্চে ভাত-কাপড়ের প্রয়োজন।"

উমাতারা কহিল, "বই-এ যখন লেখা আছে, তখন সংসারেও এমন পাঁচ-দশটি নিশ্চয়ই আছে।"

অসহিষ্ণু বিমল কহিল, "বইএর কথা আমি অত বিশ্বাস করিনে।"

"তা না হয় না, করলে. কিন্তু কারো কারো জীবনে সুখ হয় না বলেই তুমি যে একেবারে—"

বিমল বাধা দিয়া কহিল, "দাম্পত্যজীবনের আদর্শকে নরকে ডোবাতে চাইছি—না? সে কিন্তু আপনি ডুবচে।—দেখে শুনে ভাবচি, যা হয় হোক্ গে, আমি তো তফাৎ রইলুম।"

"কেন! তুমি তো সব বিষয় বেশ ভালই বোঝ; বিয়ে করে দেখাও না আদর্শ দাম্পত্যজীবন কাকে বলে!"

"আমার কাজ নেই বৌদি, সময়ের স্রোত আমি ঠেকাতে পারব না, সারাজীবন কেবল একটা দুঃসাধ্য-সাধনের চেষ্টাতেই কেটে যাবে।—একলাও এ-সংসারে সুখ পাওয়া যেতে পারে।"

উমাতারা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, আমি টাকা দেব, আমায় একটা ভাল চরকা, আর কিছু তুলো কিনে এনে দেবে?"

বিমল উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কেন দেব না! নিশ্চয়ই দেব, বৌদি!"

"তবে আজ বেরোবার সময় টাকা নিয়ে যেয়ো—এখন আমি উঠি—"—বলিয়া উমাতারা আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জিনিষপত্র এলোমেলো। বিছানা পাতা হয় নাই। ঝি হ্যারিকেন জ্বালাইয়া দ্বারের নিকট রাখিয়া গিয়াছে। উমাতারা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইল। সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া সে বুঝিল স্বামী আসিতেছেন। বহুপূর্ব্বে এই পদশব্দে উমাতারার চিন্তাহীন হৃদয়ে কোন ভাববিপর্য্যয় ঘটিত না। কিন্তু অল্পদিন আগে তাহার হৃদয়ে যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়ে স্বামীর পদধ্বনি শুনিলে তাহার বুকের ভিতরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে থাকিত। আজ কিন্তু হর্ষ বা বিষাদ কোনটাই টিঁকিল না। স্বামীর প্রতি তার প্রায় একটা বিদ্বেষই জন্মিতে লাগিল।

দ্বারের কাছে আসিয়া শ্রীপতি কহিল, "আলোটা বাইরে কেন?"—বলিয়া লণ্ঠন হাতে গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিল উমাতারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীপতি চারিদিকে চাহিয়া কহিল, "ঘরটা এত নোংরা হয়ে আছে কেন?"

উমাতারা মনে মনে হাসিল। পুরুষমানুষ এমনি দোষানুসন্ধানকারী বটে! রোজ যে এত সাজাইয়া রাখে তার জন্য কোন প্রশংসা পাওয়া যায় নাই। আজ অপরিষ্কার ঘরখানা চোখে পড়িয়া গেছে! সে কোন উত্তরই দিল না।

শ্রীপতি জামা-চাদর আল্‌নার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। আপন মনে গজ্‌-গজ্‌ করিয়া কহিল, "কাজতো একটা করতে দেখিনে, সারাদিন নভেল পড়া, সারাদিন গল্প—"

উমাতারা হঠাৎ কহিল, "তা হ'লে আজ আমি রান্নাঘরে যাচ্চি না।"

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া শ্রীপতি কহিল, "তার মানে?"

উমাতারা কহিল, "রান্নাটা আপনি তৈরি হ'বে। রোজই তো হচ্ছে, আমি তো কোন কাজই করি নে।"

হতবুদ্ধি শ্রীপতি কোন কথা কহিল না। বাতির আলোয় ঈষৎ কটাক্ষে যখন স্ত্রীর মুখে একটা অস্বাভাবিক কঠোরতার ছায়া দেখিল তখন সে একেবারে চুপ করিয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, বাস্তবিকই যদি স্ত্রী রাঁধিতে না যায় তবে কি করা যাইবে?

তাহাকে বেশীক্ষণ দুশ্চিন্তায় কষ্ট পাইতে হইল না। উমাতারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; এবং পরক্ষণে দ্বিতলের রন্ধনশালায় পরিচারিকা ও গৃহিণীর চলাফেরার আভাসে ও মিলিত কণ্ঠস্বরের মুখরতায় শ্রীপতি বুঝিল রন্ধন চ'ড়িয়াছে।

চিন্তা হইতে মুক্তি মিলিল বটে, কিন্তু বর্দ্ধিত বিস্ময়ের সহিত শ্রীপতি ভাবিতে লাগিল, স্ত্রীলোক যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণই পুরুষের অধীন থাকে; অধীন থাকাটা তাদের স্বভাব বা বাধ্যতা নয়,—নিছক খুসী! ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে তাহারা সমস্ত শাসন অতিক্রম করিতে পারে, তাহারা ভয়ঙ্করী!

সেই রাত্রে আহারের কোন ত্রুটি না হইলেও শ্রীপতির নাসিকাধ্বনি তেমন অব্যাহত রহিল না।

৬

উমাতারা তাহার শয়ন-কক্ষসংলগ্ন একটি ছোট কুঠুরীতে চরকায় সুতা কাটিতেছিল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। শ্রীপতি এইমাত্র কাজে বাহির হইয়া গেছে। জানালার বাহিরে প্রখর রৌদ্র। মাঝে মাঝে গলির মধ্যে ফেরিওয়ালার ক্লান্ত নিদ্রালস কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে।

উমাতারা একমনে আপনার কাজ করিতেছিল। একবার হাত চালানো বন্ধ করিয়া সে মুখ তুলিয়া জানালার পথে আকাশের দিকে চাহিল। স্বেদসিক্ত চূর্ণ কেশরাশি ললাট হইতে সরাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

"বৌদি—"

উমাতারার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে আনন্দের দীপ্ত আভা খেলিয়া গেল। কেবল মাথা নাড়িয়া সে বিমলকে সস্নেহ আহ্বান করিল।

বিমল কহিল, "কি ভাব্‌ছিলে বল দেখি?"

"ভাব্‌ছিলাম এই জীবনটার কথা।"

"কি!"

"ভাব্‌চি—কতদিকেই এই জীবনটা ঘুরে-ফিরে চলেছে, কিন্তু এর শেষ কোথায়!"

"শেষের কথা এখনি ভাব্‌চ কেন? জীবনটাকে সার্থক করবার চেষ্টা কর। মানুষের অধিকার সমস্ত তোমায় ভগবান দিয়েচেন, কিন্তু তুমি সেই দানের মর্য্যাদা ভুলে আর একজন মানুষের পায়ের ধূলো হয়ে থাকবে—এটা কি ভগবানকেই অপমান করা হয় না?"

"সত্যি বটে! কিন্তু সব্বাই তো ঐ রকম।"

"বিবেচনার অভাবে।"

উমাতারা একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। তার পরে কহিল, "ঠাকুরপো, কি যে আমার হয়েচে তা

তোমায় বল্‌তে পারবো না। ঘরকন্নার কাজে আর মন যায় না। কেবলি মনে হয় কেন এ-সব করচি! ওঁর সমস্ত একঘেয়ে কথা—যেন অসহ্য মনে হয়। কি যে হ'বে আমার—"

"বৌদি, তুমি ভেবো না, এ-সব শুভ লক্ষণ, একমনে দেশমাতার বন্দনা কর।"

"তাই ত করচি, কিন্তু প্রাণে শান্তি আসে না কেন ভাই! এর আগে খুব একটা ভুলের মধ্যে ছিলুম বটে, কিন্তু মনে কোন অশান্তি ছিল না—"

"আচ্ছা বৌদি, শিশু যখন ধূলোকাদা নিয়ে খেলা করে তার তো কোন অশান্তি বোধ থাকে না; সংসারে প্রবেশ করলেই না—দুঃখ বিপদ অশান্তি এসে জোটে—, তাই বলে কি এই সংসারের চেয়ে সেই খেলাঘরটা বড় হ'ল?"

উমাতারা কহিল, "তা কি হয় কখনও! তবে আমার বোধ হয় বুঝতে দেরী আছে।"

"ক্রমেই বুঝবে।"

আরো দুই একটা কথার পর বিমল চলিয়া গেল। উমাতারাও চরকা রাখিয়া উঠিল। কিছুই ভাল লাগে না। প্রাণের ভিতরে কি যে অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, কোন মতেই তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৬

কতক্ষণ পরে সে শয়ন-কক্ষে পদশব্দ পাইয়া বুঝিল শ্রীপতি বাড়ী আসিয়াছে। আজকাল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। একজন আর একজনকে এড়াইয়া চলে। যন্ত্র-চালিতের মত দু'জন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করে। রাত্রিকালে নিভৃত শয্যাতলে দম্পতি যখন একত্র মিলিত হয়, তখন বাক্যের অভাবে সেই নিরুদ্ধ নির্ব্বাণদীপ কক্ষ অনন্ত অন্ধকার ও অভগ্ন নিস্তব্ধতা লইয়া বিরাজ করে।

উমাতারা দালানে দাঁড়াইয়া শুনিল শ্রীপতি "ঝি, ঝি" বলিয়া ডাকিতেছে। অগত্যা সে দরজার নিকটে গিয়া কহিল, "ঝি বাড়ী নেই।"

শ্রীপতি উত্যক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কোথায় পাঠালে আবার!"

"পাঠাইনি, সে নিজেই ছুটি নিয়ে তার মেয়ের বাড়ী গেছে।"

"তা বেশ, এখন আসে কখন তার ঠিক নেই। বাড়ী এসে একটু তামাক পাব তাও অদৃষ্টে নেই।"

উমাতারা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীপতি লোকটি বোকা নয়। স্ত্রীকে দিয়া তামাক সাজানো ইতিপূর্ব্বে বহুবার হইয়াছে। কিন্তু উমাতারার গত কয়দিনের কঠোর ও উদাসীন ব্যবহার লক্ষ্য করার পর আজ তাহাকে এই আদেশ দিতে পারিল না। কেবল কহিল, "নিজেরই সেজে নিতে হ'বে, এমন কেউ নেই যে—"

উমাতারা কহিল, "না খেলেই হয়।"

চোখ বড় করিয়া শ্রীপতি কহিল, "কি রকম?"

"তামাক খাওয়া ছেড়ে দিলেই হয়, একটা নেশার এতটা অধীন হওয়া কেন?"

শ্রীপতির সহসা কথা যোগাইল না।

উমাতারা কহিল, "তোমাদের কাগজেই আজকাল দেশের দুর্দ্দশার কথা পড়চি। লক্ষপতি সর্ব্বস্ব বিলিয়ে ভিখিরী হয়েচে তাও তো শুনলুম, আর আমরা—"

শ্রীপতি কহিল, "তোমাকে আমি তামাক সেজে দিতে তো বলিনি।"

"সেজন্য কি! বল নি, বল্লেও কি আমি দিতাম!"

শ্রীপতি বিস্মিত নেত্রে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "বল্লেও তুমি দিতে না?"

উমাতারা তীব্রভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "কেন দেব?"

শ্রীপতি আর কথা কহিল না। হুঁকা ও কলিকা গৃহকোণ হইতে তুলিয়া লইল, এবং নিঃশব্দে রান্না ঘরে চলিয়া গেল।

৭

বিকালবেলা উমাতারা তাহার চরকা লইয়া বসিয়াছি

এমন সময় আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীপতি সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

উমাতারা মুখ তুলিয়া চাহিতেই শ্রীপতি কহিল, 'ও, আজকাল এইসব হচ্চে বুঝি?"

"কি?"

শ্রীপতি ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "দেশের কাজ!"

উমাতারা শান্তভাবে কহিল, "হ্যাঁ, চেষ্টা করচি; দেশের কাজ করা উচিত এ তো কাগজে হাজার বার লিখচো—আমি তাই কাজে করচি—"

"তা বেশ করচো, কিন্তু এ-সব সংগ্রহ করলে কি করে?"

"চুরি করে আনি নি।"

"তা আমি জানি, টাকা আমার গেছেই, কিন্তু এনে দিলে কে?"

"বিমল।"

"তুমি আমার সম্মতির অপেক্ষাও রাখোনি ?"

"ভালো কাজে আমি কারুরই সম্মতির অপেক্ষা রাখিনে। তাছাড়া কাগজে তুমি—"

শ্রীপতি বাধা দিয়া বলিল, "চুলোয় যাক্ কাগজ—কিন্তু তুমি আজকাল হয়েছ কি! কি যে ছাইপাঁশ রাঁধ মুখে দেওয়া যায় না—"

"খাওয়া পরাটাই ত সংসারে সব নয়।

"আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্—"

"তা থাক্ না। কিন্তু এ নূতন কথাতো কিছুই নয়। তোমার কাগজে পড়েই আমার শিক্ষা।"

শ্রীপতি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হায়রে, কাগজে যাহা লেখা যায় তাহা যদি ঘরের মধ্যে স্ত্রীর মনে সত্য হইয়া উঠে তবে যে কতবড় বিপদ ঘটিতে পারে তাহা বেচারা সম্পাদকের আগে জানা ছিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "মেয়েদের কাজ কি নেই?"

উমাতারা কহিল, "নয় কেন?"

"ঘরের কাজ-কর্ম্ম স্বামীর সেবা ভাসিয়ে দিয়ে—"

"ভাসিয়ে দিচ্চে কে! সবই তো করচি, কিন্তু এই হ'ল আমার সব চেয়ে বড় কাজ।—'এক ক্ষুদ্র গৃহে, এক ক্ষুদ্রতম সংসারের সেবা করা রমণীর একমাত্র ব্রত নহে, রমণীও অনন্যমনা হইয়া দেশমাতার শুভ সাধনা করিবেন'—একথা তো "হিতৈষী"তেই বার হয়েচে।"

"সুতরাং এই ভাবে চলতে থাকবে?"

"অবশ্য উচিত, এখন মতি স্থির থাকলে হয়।"

শ্রীপতি আর সেখানে দাঁড়াইল না।

ইহার দিন পাঁচ-ছয় পরে সোমবার দিন সকালবেলা কি কাজে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া উমাতারা দেখিল, টেবিলের উপর একখানি নূতন "হিতৈষী" পড়িয়া আছে। পাতা খোলা—খুব বড় অক্ষরে "হিন্দু রমণীর গৃহধর্ম্ম" নাম দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। উমাতারা বুঝিল, এই প্রবন্ধ তাহার চোখে পড়াইবার জন্যই স্বামী ওটাকে ওখানে ফেলিয়া গিয়াছেন। উমাতারা তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল। গৃহকার্য্য, সন্তানপালন, স্বামী ও পরিজনের সেবা নারীর পরম কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচিত হইয়াছে। সেই বর্ণনাবহুল বিস্তৃত আলোচনার কোন ফাঁকেই হতভাগ্য দেশ একটুকু উঁকি পাড়িতে পারে নাই। লেখকের নাম রহিয়াছে "নারীবন্ধু"। উমাতারার হাসি আসিল। তাহাকে সংশিক্ষা দিবার জন্য যে স্বামী আজ বেনামে এ উল্টা চাল চালিয়াছেন সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না। কাগজখানা নির্দ্দয়ভাবে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন মধ্যাহ্ন-আহারে বসিয়া শ্রীপতি প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "আজকের 'হিতৈষী' পড়লে?"

উমাতারা কহিল, "হ্যাঁ, আজকে আর কিনে আনতে হয় নি, টেবিলেই পড়েছিল।"

শ্রীপতি এই খোঁচাটুকু পরিপাক করিয়া কহিল, "পড়লে না কি?"

"হ্যাঁ, খানিকটা। কাগজখানার কোন স্থির মতামত নেই দেখচি।"

কাগজের নিন্দায় জ্বলিয়া উঠিয়া শ্রীপতি কহিল, "কিসে দেখ্‌লে ?"

"খুব স্পষ্ট দেখলুম আর কি ! গেল সপ্তাহের কাগজে দেশসেবা-ব্যাপারে মেয়েদের কাজ নিয়ে খুব আলোচনা হয়েচিল, এবারে ঠিক তার উল্টো কথা বেরিয়েছে। সেবা নইলে নিজেদের চলে না, তাই পুরুষ লেখকরা মেয়েদের কেবল সেবা করবারই উপদেশ দেয় ! এইসব মানুষরাই তো দেশোদ্ধার করবে !"

শ্রীপতির মুখের উপর কে যেন গাঢ় কালিমা লেপিয়া দিল। এমনভাবে স্ত্রীর অন্তরের চেহারা আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। উমাতারা যে একেবারেই আয়ত্বের অতীত হইয়া গিয়াছে এই কল্পনা তাহার স্বামীত্বের অহঙ্কারে ঘা দিতে লাগিল। কি করিলে আবার সেই পূর্ব্বের নিরুপদ্রব দিনগুলি ফিরিয়া পাওয়া যায় তাহাই তার চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

মামীরা দিনকতকের জন্য দেশের বাড়ীতে যাইবেন। তাঁহাদের মহলে কয়দিন ধরিয়া সেই আয়োজন চলিতেছে। বিমল আসিয়া উমাতারাকে কহিল, "বৌদি, আমি তো আবার মেসে চলেছি। এখন আর দু'বেলা দেখা হ'বে না।"

উমাতারা হাসিয়া কহিল, "একবেলাই দেখা হ'বে না, তুমি আবার দু'বেলার কথা বলচ ?"

বিমল শুষ্ক হইয়া বলিল, "কেন, আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে না কি ?"

"তা নয়, কিন্তু আমি রাজপুরে যাচ্চি যে।"

"মার সঙ্গে ? বল কি ?"

"হ্যাঁ, সত্যি। দিনকতক এই পায়রার খোপটা ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে হয়, তা আর কোথা যাব ! তিনকুলে তোমরা ভিন্ন আর কেউ তো নেই।"

"কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কিসের ! মামীমা তো রাজী হয়েচেন।"

"আর দাদা ?"

"ভয় নেই, তাঁর আপত্তি হ'বে না।"

বিমল সবিস্ময়ে কহিল, "সত্যি নাকি ? এত স্বাধীন ?"

উমাতারা সগর্ব্বে কহিল, "হ্যাঁ, এতই স্বাধীন।"

৮

মামীর মুখেই শ্রীপতি শুনিল, উমাতারা তাঁহাদের সহিত রাজপুরে যাইবে। মামী যাহা স্বাভাবিক তাহাই ভাবিয়াছিলেন, তাই কহিলেন, "বৌমা আমার সঙ্গে যাবেন ঠিক করেচেন, তোমার অসুবিধা হ'বে না তো বাবা ?"

শ্রীপতি ভাবিল, ইঁহারা মনে করিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী মিলিত পরামর্শে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। উমাতারা যে তাহার মতের কোন অপেক্ষাই রাখে নাই, তাহার আভাস দিতেও সে কুণ্ঠিত হইল ; বাধ্য হইয়া তাহাকে বলিতে হইল, "না, অসুবিধা আর কি ?"

কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নিজের ঘরে গেল। উমাতারা একটি ছোট বাক্সে খানকতক কাপড় গুছাইয়া লইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে শ্রীপতি কহিল, "এ-সব কি শুনছি ! রাজপুরে যাচ্ছ নাকি ?"

উমাতারা বলিল, "হ্যাঁ।"

এক মুহূর্ত্ত শ্রীপতি স্তব্ধ হইয়া রহিল ; কঠোর বাক্য আর সম্বরণ করিতে পারিল না ; কহিল, "তুমি তাহ'লে আমার সঙ্গে কিছু সম্পর্ক রাখতে চাও না ?"

উমাতারা একটু থামিয়া সহজভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "যে সম্পর্ক দু'দিনের বিচ্ছেদের আঘাত সইতে পারে না, তা'কে বাঁচিয়ে চলবার জন্য সমস্ত দীনতা মাথায় তুলে নেওয়া আমি গৌরবের মনে করি নে।"

শ্রীপতি কি বলিবে তাহা কতক্ষণ ভাবিয়া পাইল না, তারপর কহিল, "তোমার কি ভয়ও কিছু নেই ?"

"কিসের ভয় ?"

"আছে কি নেই, তাই জিজ্ঞেস করচি।"

"নেই। ভয় করব কেন ? এই সংসারের সামান্য দুঃখ-সুখের ব্যতিক্রমকে আমি তিলমাত্র ভয় পাই না। আমার কিছু না হ'লেও চলে, তবে আর কাকে ভয় করে থাকব !"

"তুমি কোন আশঙ্কাও কর না ?"

"আশঙ্কার এতে কি আছে ? তোমার কাছে তো আমি চিরকালের অপরাধী, এই চলে যাওয়াতে আর কত অপরাধ বাড়বে ! আর না গেলেই কি আদর বাড়বে কিছু ?"

শ্রীপতি উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন ভোরের ট্রেনে সকলে রাজপুরে রওয়ানা হইল। বিদায় ব্যাপারে উমাতারা কোনই বিশেষত্বের সৃষ্টি করিল না।

নয় বৎসর পরে উমাতারা আবার পল্লীগ্রামে আসিল। তখন সমস্ত পল্লীপ্রকৃতির উপরে একটি বর্ষাধৌত সজল শ্যামলতা বিরাজ করিতেছিল ; উমাতারার ক্লান্ত দেহমন সেই শোভায় জুড়াইয়া গেল। তাহার কয়দিনের আঘাত প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত হৃদয় সুস্থ হইয়া উঠিল। দ্বিতলের যে কক্ষে উমাতারা শয়ন করিত, তাহার দক্ষিণভাগটা একেবারে খোলা। খানিকটা স্থান জুড়িয়া জমীদার বাটীর ফুলের বাগান, তারপরে পাকা দেওয়াল ; দেওয়ালের বাহিরে প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির পরপারে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষান্তরালে গ্রামবাসীদের ক্ষুদ্র কুটীরগুলি দেখা যাইত। সেইদিকে চাহিয়া উমাতারার তৃপ্তি হইত না। সেই অতি সামান্য ভূমিখণ্ড, তুচ্ছ পর্ণকুটীর ও দীঘির কালো জল কোন্ মন্ত্রে তাহার মন আকর্ষণ করিয়া লইত। ঐ ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্য কত পল্লীবধূ তাহাদের নিত্যকার জীবন যাপন করিতেছে, সুখে আছে অথবা দুঃখে আছে তাহা কে জানে ! এই অপার রহস্যের মোহ উমাতারার মনের মধ্যে একটা উদাস আবেগ সৃষ্টি করিত, উমাতারার হঠাৎ মনে হইত, সে যেন বড় একা। জীবনের ব্যর্থতা যেন রূপ ধরিয়া তার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিত, তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু অশ্রু আসিত না।

উমাতারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে যে দর্পভরে মনে করিয়াছিল সে সমস্ত সুখ-দুঃখ পরাজিত করিয়াছে, তাহার সংসার স্বামী না হইলেও চলে, সে দর্প তাহার কোথায় গেল ? সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, যে গৃহ সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে সেই গৃহের জন্য তার মন কাঁদিতেছিল। এখানে বিমল নাই, "হিতৈষী" নাই, চরকা-খদ্দর কিছুই নাই। স্বদেশপ্রেমকে অন্তরে জাগাইয়া রাখিবার মত একটা অতি তুচ্ছ অবলম্বনও উমাতারা খুঁজিয়া পাইল না। এখানে কেহ দেশের কথা কহে না ; সকলেই নিজের সুখ-দুঃখ পরিবার পরিজন লইয়া আছে—বেশ আরামেই আছে।

তবে কি সে এখনি স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইবে ? সে পথ তো খোলাই আছে। শ্রীপতির ইচ্ছা ছিল না সে এখানে আসে।

উমাতারার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, এমন সময় এক নূতন সংবাদে সে সচেতন হইয়া উঠিল।

কলিকাতাবাসিনী সেই ধনীকন্যার সহিত বিমলের বিবাহ স্থির হইয়াছে। আগে নাকি বিমলের মত ছিল না ; পরে মেয়ে দেখিয়া মত হইয়াছে।

খবর শুনিয়া উমাতারা অবাক্ হইয়া গেল।

বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও আলোকসজ্জাসহ বিমলচন্দ্র নববধূ লইয়া বাড়ী আসিল।

বৌ-এর রূপ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে পল্লীবাসীরা মুগ্ধ হইয়া গেল।

কেবল উমাতারার মনে সুখ ছিল না। সমস্ত উৎসবের অন্তরালে তাহার উপবাসী হৃদয় গোপনে কাঁদিতেছে। এ ক্রন্দন কিসের? নারীহৃদয়ের চিরন্তন ক্রন্দন। স্বামীর প্রেম, সন্তানের স্নেহ, পরিজনের প্রীতি দিয়া নারী যে কল্পনার স্বর্গ হৃদয়ে নির্ম্মাণ করিয়া রাখে, সেইখানে প্রবেশপথ যখন দৈব বিপাকে রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ক্রন্দন ছাড়া আর দ্বিতীয় গতি থাকে না।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, বিমলই তো তাহাকে স্বর্গচ্যুত করিয়াছে। আর আজ সে নববধূ, নবীন প্রেম লইয়া মত্ত। উমাতারার আর সহ্য হইল না; সে দ্রুতপদে বিমলের ঘরের দিকে চলিল। বিমল সেখানে একা একখানি বই পড়িতেছিল। উমাতারা কণ্ঠস্বরে তীব্রতা ঢালিয়া ডাকিয়া উঠিল, "ঠাকুরপো—"

বই নামাইয়া বিমল উমাতারার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তি দেখিল।

"ঠাকুরপো, বিয়ে করা ভুল, সংসার মিথ্যে—এই সব বুঝিয়ে আমাকে—"

বিমল চেয়ার টানিয়া কহিল, "বৌদিদি, বোস, অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? তোমার এই কথার জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত আছি, একটু শান্ত হয়ে শোন।"

"শুনব আর কি ঠাকুরপো! বিয়েটা ভুল ভেবেছিলে, এখন জেনেছ সে কথা কত মিথ্যে! তা বেশ ভাল, তোমরা সুখী হও ভাই, কিন্তু আমার ফিরে যাবার পথ করে' দাও।"

"বৌদি শোন, বিয়ে করা ভুল বলে ভাবতাম, এখন দেখছি বিয়ে করাও কর্ত্তব্য। সস্ত্রীক নইলে তো হিন্দুর কোন ধর্ম্মাচরণই হয় না। দেশসেবাও ধর্ম্ম। সেখানে সহধর্ম্মিণীকে বাদ দিয়ে চল্‌বে কি করে?"

উমাতারা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আর সে যদি তোমার ধর্ম্মপথের সহায় না হয়ে হয়ে দাঁড়ায়?"

বিমল বলিল, "তাকে আমি আমার পথেই চালাব। সেটুকু শক্তি যদি না থাকে, তবে আর কোন্ শক্তি নিয়ে দেশের কাজ করব বৌদি?"

উমাতারা পথ পাইল; তার হৃদয়ের উত্তাপ শীতল হইয়া গেল।

সে কহিল, "তবে ঠাকুরপো, আমিও তো আমার স্বামীর মন ফেরাতে পারি?"

বিমল কহিল, "তা পারো।"

কিন্তু তাহার কথাগুলি যেন যন্ত্রের মত প্রাণহীন সুরে উচ্চারিত হইল।

উমাতারা বুঝিল, বিমল মন খুলিয়া সায় দিতেছে না, কিন্তু তার উৎসাহ বাধা মানিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কবে যাচ্ছ?"

বিমল কহিল, "কাল। ক'দিন কলেজ কামাই গেল।"

"আমিও ঐ সঙ্গে যাব। ভাল কথা তোমার বিয়েতে উনি এসেছিলেন কি?"

"হ্যাঁ—" বলিয়া বিমল আবার বইএর পাতা খুলিল।

হৃদয়ভরা শান্তি লইয়া উমাতারা আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। জীবনের গতি স্থির হইয়াছে, আর ভুল পথে চলা নয়। সে স্বামীর মন ফিরাইবে। স্বামীর প্রেমের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া জীবনকে শান্ত করিবে, সুন্দর করিবে। কি আনন্দ, কি আনন্দ!

সেই দিন রাত্রে শুইয়া তার ঘুম আসিল না। কল্পনায় কত রঙ্গীন ছবি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পরদিনটা অতি কষ্টে যেন শেষ হইল। উমাতারার মনে হয় ঘড়ির কাঁটা সেদিন অস্বাভাবিক দেরীতে চলিতেছে। সন্ধ্যাবেলা সে কাপড় চোপড়গুলি দেখিয়া লইতেছিল। রাত্রি আটটায় রওনা হইতে হইবে।

বিমল আসিয়া ডাকিল, "বৌদি—"

"কেন ভাই ঠাকুরপো ?"

অন্তরের আনন্দে তাহার কণ্ঠস্বর স্নেহার্দ্র ও কোমল শুনাইল। বিমলের উপর আর তার রাগ ছিল না।

"বৌদি—এখানে কি তোমার কোন অযত্ন অনাদর হচ্চে ?"

"বল কি ঠাকুরপো! এত আদর আবার করে কে আমায় ?"

"তবে যাচ্চ যে ?"

"ওমা, আমি কি সেজন্য যাচ্চি! অবাক্ করলে যে! চিরদিনই থাকতে পারে কেউ? শশী, সুরো ওরা যে চলে যাবে, সে কি আদরের অভাবে নাকি ?"

বিমল নতদৃষ্টি হইয়া কহিল, "মা তোমাকে থাকতেই বলছিলেন।"

"মামীমার বড় মায়া, কিন্তু কি করি ভাই! সেখানেও একেবারে একলা মানুষ—কি বা খাচ্চেন-দাচ্চেন, কেমন আছেন—"

বিমল মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিল। ঘন-কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের অন্তরালে রক্তিম সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে।

বিমল করুণকণ্ঠে ডাকিল, "বৌদি—"

"কি !"

"একটা কথা বলতে হচ্চে—"

"কি ঠাকুরপো, ওঁর কোন কথা কি? ও-রকম করে বল্‌চ কেন! তিনি ভাল আছেন তো!"

"ভাল আছেন বৌদি। কিন্তু তুমি, থাক—যেয়ো না।"

উমাতারা একটুক্ষণ ভাবিল; একটু ম্লান হইল। কিন্তু আবার তার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; সে কহিল,

"আমি বুঝেছি তুমি কি ভাবচো। না ভাই, তুমি একটুও ভেবোনা। না হয় দুদিন একটু অনাদর-অবহেলা সইতে হ'বে, কিন্তু সে কতক্ষণ? আমার ভালবাসার কাছে সে অনাদর কি স্থায়ী হ'বে! আমারই স্বামী, আমি তাঁকে পা'ব না, একি হ'তে পারে ?"

বিমল অন্যদিকে চাহিয়া কহিল, "বৌদি, আমি নিজে দেখে এসেছি—"

"কি !"

"দাদা আবার বিয়ে করেছেন, সেখানে তোমার ফিরে যাবার উপায় নেই।"

বিমল চলিয়া গেল।

খোলা বাক্স এলোমেলো ছড়ানো কাপড়-চোপড়ের মধ্যে উমাতারা স্তব্ধ মূর্চ্ছাহতের মত বসিয়া রহিল।

পশ্চিমাকাশে ঘনমেঘ ও দীপ্ত দামিনী আসন্ন ঝটিকার আভাষ দিতেছিল।

উমাতারা একটি কথা ছাড়া আর সব ভাবিয়াছিল।

সূর্য্য জাগে—

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন

উদয় গিরির শিরে আমার
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!
ভুবন আমার সোনা হয়ে
গেছেই রাগে—কিরণ রাগে!
দিক্‌বিদিকে পর্দ্দা টুটে
জ্যোতির সায়ক উঠছে ফুটে!
বিশ্বগ্রাসী হল্‌কা ওঠে
আঁধার-কূটে ঝল্‌কা লাগে
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!

উদয় পুরে ওই যে আমার
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!
জ্যোতির দুলাল নাচছে শিরে
দলি' আঁধার-কালীয় নাগে।
ভুবন হলো নন্দপুরী
মহাভাবের রসেই ভরি'!
মহোৎসবের রঙ্গ তুরী
উঠ্‌ল বেজে বৃন্দ-বাগে!
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!

গোপপুরীতে ওই যে আমার
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!
মুছিয়ে দিলে ভাসিয়ে নিলে
তন্দ্রা নিদ্রা মরণ দাগে!
সারাটি রাত পূবের পানে
চেয়েই আছি যার ধেয়ানে,
দ্বারকপুরীর দুয়ার শানে
মাথা কুটে' ভিক্ষা মাগে
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!

সর্ব্বপুরে ওই যে আমার
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!
ডুবে গেল গলেই গেল
সকল আমার সর্ব্ব ভাগে!
বিশ্ব লুটে মুঠে মুঠে
অঞ্জলিতে—হৃদয় পুটে—
আঁলোর গঙ্গা-বন্যা ছুটে
বিলকুলে সব ভাসিয়ে আগে,
সূর্য্য জাগে—সূর্য্য জাগে!

পঞ্চরত্ন

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

নিবন্ধের নামকরণ থেকেই বুঝতে পারছেন যে, পাঁচটি রত্নের পরিচয় আমি দেব।

কথাটা আর একটু ভেঙ্গে বলি। আমাদের দেশে খুব কাল মেয়ের নামও গৌরী রাখা হয়, খুব গবুচন্দ্র শ্রেণীর লোকও জ্ঞানেন্দ্র নামের গর্ব্ব ক'রে বেড়ান। আমি ও আমার রত্নগুলিও প্রায় সেই শ্রেণীর।

রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' লিখেছেন। বরাতগুণে সেটা বাংলা-সাহিত্যের পঞ্চরত্ন হ'য়ে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" জল্ জ্বল্ করবে। আর আমার এ পঞ্চরত্ন যে লিখতে লিখতেই পঞ্চ ভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা আপনারা পড়তে পড়তেই বুঝতে পারবেন। সাধে কি আর লোকে রবীন্দ্রনাথের উপর চটে!

তা' ব'লে এঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের "পাঁচটি এয়ারের" দলেরও নন। এঁরা সকলেই ডিগ্রীধারী, কেউ কেউ আবার ডবল ডিগ্রীর ডাণ্ডা নিয়ে ছাত্রদের ভীতি ও বিস্ময়ের হেতুস্বরূপে বিরাজ করছেন। আর এঁদের মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই ধার্ম্মিক সনাতনপন্থী। তাঁরা পুরী বেড়াতে গেলে জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখতে ভোলেন না এবং কাশীতে এসে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথের মাথায় হাত বোলানো—এ দুয়ের কোনটাতেই বিরক্তি নেই। তবে পবিত্র হিন্দু গরম-গরম চপে যে এঁদের কারও বিশেষ আপত্তি হবে তা' মনে হয় না। এই তো গেলেন চারজন। আর পঞ্চমটি ধার্ম্মিক না হ'লেও ঠিক অধার্ম্মিক নন। এককথায় বলতে গেলে তিনি হ'চ্ছেন আধুনিক।

এঁদের পাঁচজনের নাম—ত্রিলোচন গুপ্ত, শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোস্বামী, চিত্তপ্রিয় চাকলাদার ও জীবনানন্দ চৌধুরী।

এঁদের মধ্যে ত্রিলোচন গুপ্তই শাঁসাল লোক। আড্ডাটা রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতেই বসে, কারণ চা পান ও তামাক চুরুটের রসদ জোগাবার ক্ষমতা এক মাত্র তাঁরই আছে। আর রসদের জোরেই তিনি সমাজের মধ্যে রসিক ব'লে পরিচিত। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কোন বিষয়েই তাঁর কথা বলতে বাধে না। কোনো সওদাগরী আফিসের তিনি প্রধান খাজাঞ্চী।

শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডবল বিয়ে ও ডবল এম, এ। তিনি কলিকাতার কোন বিখ্যাত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। অত্যন্ত Puritan—অর্থাৎ মানসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক। তাঁর জীবনের একটা মস্ত বড় দুঃখের হেতু তাঁর অশ্লীলতাব্যঞ্জক নামটা। নামটা বদলাবেন ঠিক করেছিলেন, এমন সময় হাতে পড়ল কতকগুলি "থিয়সফির" বই। সেগুলি পড়ে বুঝলেন যে পিতামাতার আদরের-দেওয়া নাম কিছুতেই বদলান উচিত হবেনা, কারণ তাহলে তাঁরা Astral Plane এ অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। সুসন্তান হ'য়ে তিনি বাপমাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেন কি ক'রে?

গোবিন্দ গোস্বামী পরম বৈষ্ণব, সদ্ব্রাহ্মণ ও সনাতনপন্থী। যৌবনে প্রতি প্রভাতে স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে গঙ্গা স্নান করতেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্লেষ্মার ধাত এবং গৃহিণীর বাত হওয়াতে, সে অভ্যাস ত্যাগ করতে হ'য়েছে। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণার্থে গৃহিণীকে একটি মকরমুখো তাগা গড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিজের ছড়ির মাথায় একটি মকরের মুখ বাঁধিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন,—এ ঘোর কলি, আমাদের মত পাতকীর কি গঙ্গাস্নান সহ্য হয়? এই যে নিত্য তাঁর বাহনকে স্পর্শ করছি—এতেই সর্ব্বপাপ ক্ষয়। কিন্তু

দুষ্টলোকে বলে, গোস্বামীমতে পরাহে একাদশী ও অন্যান্য পার্ব্বণের পারণ ছাড়া তিনি আর কোনই বৈষ্ণববিধি পালন করেন না। তাঁর কথাবার্ত্তার মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরাজী ফোড়নের ঝাঁঝটা একটু দুঃসহ। সংসার চালাবার কথা তাঁকে কোনদিনই ভাবতে হয় না—গোবিন্দের ইচ্ছায় তাঁর সংসার চলে যায়—তাঁর শিষ্যদের রোজগারে।

চিত্তপ্রিয় চাকলাদার বি-এ, বি-এল, পুলিসকোর্টের উকীল। তাঁর আর যাই থাক মতামতের কোন বালাই নেই। যেদিকে সংখ্যাধিক্য থাকে সেই দিকেই তিনি ঝোঁকেন। সেই জন্যে সকলেই তাঁর উপরে খুসী।

পূর্ব্বোক্ত সকলেই প্রৌঢ়, কিন্তু জীবনানন্দ চৌধুরী যুবক—স্কুলমাষ্টারী ক'রে দিন গুজরাণ করেন। পড়া শুনা আছে মন্দ নয়। কিন্তু পড়ার চেয়ে তাঁর শোনা বেশী এবং এতদুভয়ের চেয়ে বলার অভ্যাস ঢের বেশী। যেখানে তাঁর বদনকণ্ডুয়নের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়, সেখানেই তাঁকে দেখা যায়। এই সম্পর্কেই তাঁর এই সান্ধ্য-বৈঠকে আগমন। তাঁর ধারণা তিনি সাহিত্য ও আর্টের একজন মস্ত বড় সমঝদার। তাই এই সান্ধ্য বৈঠকে তিনি মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চ্চা ক'রে থাকেন এবং বাৎসরিক আর্টের চর্চ্চা ক'রে থাকেন দেশের থিয়েটার ক্লাবে। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়ে এমন সব কথা বেরিয়ে পড়ে যা শুনলে হঠাৎ তাঁকে রসিক ব'লে ভ্রম হ'তে পারে।

একদিন সান্ধ্যবৈঠকে জীবনানন্দ ভিন্ন সকলেই উপস্থিত। গোস্বামী প্রভু

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা!'

এই শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা করতে করতে নিজেই "অহহ" শব্দে পুলকশিহরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুঁড়ির উপর হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁর শ্রোতাদের সকলের মুখেই একটা ক্লান্তি ও বিরক্তির চিহ্ন। কিন্তু পাছে অপরাধ হয়ে যায় এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারছিলেন না। এমন সময়ে জীবনানন্দের প্রবেশ। জীবনানন্দকে দেখে গোস্বামী-প্রভু ভিন্ন আর সকলেই বিশেষ হৃষ্ট হ'য়ে উঠলেন। আর গোস্বামী প্রভু নিতান্ত বিরক্ত হ'য়ে তাঁর তত্ত্বকথাকে মধ্যপথেই গলা টিপে মেরে একটু দেঁতো হাসি টেনে বল্লেন,—"এই যে জীবনানন্দ - এসো।"

এমন মধুর অভ্যর্থনার উত্তরে জীবনানন্দ বললে—"শুনলাম গোঁসাইজী আজ একজন মোটারকম মক্কেল পাকড়েছেন, কোন শাঁসাল শিষ্য। তাই বুঝি আজ সন্ধ্যায় "বিদ্যার" রূপ বর্ণনা না ক'রে তত্ত্বব্যাখ্যা করছেন। বাস্তবিক এমন দিনে একটু হরিনাম না করলে নিতান্ত নেমকহারামি হয়।"

কথাটা শুনে আর সকলের মুখেই একটু মুচকি হাসি দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল। কিন্তু চাকলাদার আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

গোঁসাইজীর রাগটা স্বাভাবিক নিয়মে গিয়ে পড়লো চাকলাদারের উপর। অস্বাভাবিক রকম চীৎকার ও মুখভঙ্গীসহকারে তিনি চাকলাদারকে বললেন, "এতে হাসির কি আছে হে চাকলাদার? জীবানন্দ নাস্তিক, ও না হয় যা ইচ্ছে বলতে পারে কিন্তু তুমি এতে হাসবার কি পেলেহে?"

ধমক খেয়ে চাকলাদার মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে, "আজ্ঞে, আর সকলে যে হাসলে।" কিন্তু আর সকলের মুখ তখন পাথরে-কোঁদা মূর্ত্তির মত গম্ভীর হ'য়ে গেছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে গোঁসাইজী বল্লেন—"কই, কে হাসলে—দেখাও না?"

শ্যামানন্দ নিজেও একটু হেসেছিলেন। কিন্তু এত ক্ষণে সামলে নিয়ে বললেন, "বিশেষতঃ চৌধুরী মশাই যে ইঙ্গিত করলেন সেটা নিতান্ত objectionable—বিদ্যাসুন্দর কাব্যটা কি ভদ্রলোকের আলোচনার যোগ্য?"

উত্তরে একটু হেসে জীবনানন্দ বললে, "কিন্তু আপনা

দাদার কাছে শুনেছি – school periodএ বিদ্যাসুন্দর এবং college periodএ Don Juan আপনার নিত্য-সঙ্গী ছিল—এমন কি মাথার বালিশের তলায় রেখে অনেক রাত্রি নিদ্রা গেছেন।"

গড়গড়ার নল থেকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গুপ্ত বল্লেন,—"চৌধুরী ভায়া সকলের ঘরের খবর বেমালুম সংগ্রহ ক'রে আমাদের একেবারে কাবু ক'রে রেখেছে।"

নিরুত্তর বিহ্বল শ্যামানন্দকে উৎসাহ দেবার ইচ্ছায় কথাটার একটু মোড় ঘুরিয়ে, গোঁসাইজী বললেন, "বাঁড়ুয্যে তুমি ও সব বিষয়ে চটা, কারণ তোমার moral sense injured হয়। কিন্তু যাই বল—ও রকম এক খানা কাব্য এ যুগে আর দেখা যায় না। কি জীবানন্দ কথা বলছ না যে? আচ্ছা ভাই, ঠিক করে বলতো তোমাদের ওই রবিবাবু আমাদের এই ভারতচন্দ্রের সঙ্গে লাগ্‌তে পারেন?"

চৌধুরী হেসে বল্লে—"না, তা পারেন না। কারণ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেহই প্রধান—আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেহকে ছাড়িয়ে মন ও আত্মাই প্রাধান্য লাভ ক'রেছে।"

"এ যে নতুন কথা শোনালে জীবানন্দ! রবীন্দ্রনাথ কাব্যিতে কোথাও আত্মার কথা পষ্ট করে লিখেছেন এ তো তাঁর অতি বড় ভক্তরাও বল্‌তে পারেন না। তবে হ্যাঁ, তাঁর দু-একটা গানে আধ্যাত্মিকের একটু আধটু আভাস আছে। ওই যে একটা গান আছে—

"জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে
জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর বাজে নারে" এর

মানে জান?"

জীবনানন্দ হেসে বল্লে—"না"—

গোঁসাইজী বল্লেন—"শুধু কি আর পড়ে গেলেই হ'ল! অন্ধভক্তি কুছ্‌কামকা নেই। আমরা রবিভক্ত নই বটে—কিন্তু We must give the devil his due. কথাটা হ'চ্ছে উচ্চাঙ্গ যোগের কথা। ঈড়া, পিঙ্গলা-সুষুম্না-জান তো? রবীন্দ্রনাথ কোন সময়ে যোগ করতে বসেছিলেন—কিন্তু ঠিক Process না জানাতে ঈড়ায় আর সুষুম্নায় জড়াজড়ি হ'য়ে সব মাটি হ'য়ে গেল। আমি রবিবাবুকে শ্রদ্ধা করি শুধু—"

বাধা দিয়ে জীবনানন্দ হাত জোড় ক'রে বল্লে—"ক্ষ্যামা দিন, ক্ষ্যামা দিন। আপনার শ্রদ্ধা আপনারই থাক। আপনার ওই বিপুল শ্রদ্ধার ভার এই বয়সে সহ্য কর্‌তে পারবেন না।"

হতাশভাবে গোঁসাইজী বল্লেন—"ওই তো, ভাল কথা তোমাদের মনে ধরে না।"

হঠাৎ চাক্‌লাদার বলে উঠ্‌লেন—"ত্রিলোচনবাবু আপনার লাইব্রেরীর কতদূর কি হ'ল?

একটা হাই তুলে, তিনটে তুড়ি মেরে বল্লেন—"ভালা কথা মনে ক'রে দিয়েছ ভায়া। ও বাঁড়ুয্যে মশাই, আরএকটা লিষ্টি আমাকে ক'রে দিতে হ'চ্ছে ভাই।"

শ্যামানন্দবাবু সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করলেন—"মানে? আপনি কি সেই লিষ্টটা হারিয়ে বসে আছেন নাকি? রীতিমত খেটে অনেক সময় নষ্ট ক'রে যে 'লিষ্ট'টা তৈরী ক'রেছিলাম।"

"আরে তোমরা হাত্‌ ঝাড়লেই পর্ব্বত। একটা যখন করেছ তখন আর একটা করতে কতক্ষণ। মুস্কিলের কথা আর কও কেন। পরশু Race-এ গিয়ে দেখি পকেটে আর কোন কাগজ নিয়ে যেতে ভুলে গেছি। Cash মিলিয়ে বেরুতে দেরী হ'য়ে গেছল—আর মাথার কোন ঠিক ছিল না। তাই তোমার সেই 'লিষ্টি'টার পেছুন-দিকেই calculation করেছিলাম। শেষে যে সেটাকে কোথায় ফেলে এলাম তা মনে পড়ছে না।"

সহাস্যে জীবনানন্দ ব'লে উঠ্‌ল—"আপনিও যেমন পাগল, গুপ্ত মশাই, তাই এঁদের কথায় ক্ষেপেছেন একটা Family Library-র জন্যে। কেন মিছে বাজে খরচা করবেন? তার চেয়ে আমার পরামর্শ নিন—ওই টাকায় একখানা All-world Horse-Museum করুন তাতে যত ভাল ঘোড়ার ছবি রাখুন—আর যারা আজ

পর্য্যন্ত First হ'য়ে গেছে তাদের একগাছি ক'রে বালামৃচি।"

সানন্দে সায় দিয়ে গুপ্ত বল্লেন—"মন্দ বলেনি চৌধুরী —এ রকম করতে পারলে একটা নতুনত্ব হয় বটে।"

গোঁসাইজী হেসে বল্লেন—"বুঝলে না গুপ্তজা, জীবানন্দ তোমাকে ঠাট্টা করছে।"

গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে গুপ্তজা বল্লেন—"সে কি আর আমি বুঝিনি গোঁসাইজী! ও হ'চ্ছে আজকালকার ছেলের লেখাপড়ার গরম।"

একটু হেসে জীবনানন্দ বল্লে—"আপনিও শেষে পরের কথা শুনে নাচলেন! আচ্ছা, এই আমি চুপ করলাম—আপ্!"—এই বলে দুটি ঠোঁট সজোরে একত্র করে' তার মধ্যস্থলে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে বসে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে-শুনে চাকলাদারের খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু আর সকলের মুখে হাসির কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে রইলেন।

একটু পরেই গুপ্তজা বল্লেন—"তুমি যে লাইব্রেরী নিয়ে অমন ঠাট্টাটা করলে আমায়! আমি বুঝি চাকরী করি বলে আর পড়ি না? যে রাঁধে সে বুঝি আর চুল বাঁধে না?—আচ্ছা, তোমরা না হয় খুব পড়েছ। বলতো বাপু, তোমাদের রবিঠাকুর দেশের জন্যে কি ক'রেছেন? ক'টা স্বদেশী কবিতা লিখেছেন? হেমচন্দ্রের—

'বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে—'

—এই রকম একটা কবিতা লিখেছেন দেখাতে পার?"

চৌধুরী বল্লে—"না পারি না—তার কারণ তাঁর ভাল কবিতা কোনদিনই শিঙ্গে ফোঁকেনি বা ফুঁকবে না।"

বাঁড়ুয্যে বল্লেন—"আচ্ছা ও কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। হেমবাবুর সঙ্গে রবিবাবুর তুলনা একটু বেখাপ্পা ঠেকে বটে। আধুনিকে আধুনিকেই ধরা যাক। ডি, এল, রায়ের মত নাটক একখানাও তিনি লিখতে পেরেছেন কি?"

জীবনানন্দ বললে—"না, তা' পারেন নি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের common sense অত্যন্ত strong এবং poetic sense অত্যন্ত fine"—কথাটা কয়েক দিন আগে সে একটা নিমন্ত্রণে গিয়ে একজন বাংলার সাহিত্য-সমালোচকের মুখ থেকে শুনে এসেছিল।

গোঁসাইজী আর থাকতে না পেরে সোৎসাহে ব'লে উঠ্লেন—"কি ছেলে মানুষের মত বকৃছ চৌধুরী? ডি, এল, রায়ের poetic sense কম ছিল? 'মেবার পতনে' সেই যেখানে অজয় আর মানসীতে কথা হ'চ্ছে—মানসীর মধ্যে অজয় যেন কি দেখতে পাচ্ছে—সেই যে বলছে— যে একটা, কি যেন একটা—বললাম। বাঁড়ুয্যে, আমার memory-টা বড় খারাপ। ওঃ! সেইখানটা যখনই পড়ি এই বুড়ো বয়সেও ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলি।"

বীরগর্ব্বে চাকলাদার চৌধুরীর দিকে চেয়ে বললে— "এইবার চৌধুরী—উত্তর দাও।"

জীবনানন্দ মুস্কিলে পড়ে গেল। ভেবেছিল একটা বড় গোছের কথা ব'লে সকলের মুখ বন্ধ ক'রে দেবে। কিন্তু সে তো হ'ল না। বহুবার সে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে হাততালি পেয়েছে এখন সে কথা অস্বীকার করে কি ক'রে? তাই মাথা চুলকুতে চুলকুতে সে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। কতবার তো তাঁর Dramaতে Main Part (প্রধান ভূমিকা) act করেছি। মুখস্থ 'পার্ট' বলতে বল্‌তে গা শিউরে উঠেছে! কিন্তু সেদিন এক সমালোচক বলছিলেন কিনা যে, ডি, এল, রায়ের নাটকে আসল বস্তু বিশেষ কিছু নেই! অধিকাংশই তার উচ্ছ্বাস আর উদ্ভট কল্পনা। বিশেষতঃ ভাষার একটা বিশেষ দোষ—"

বাধা দিয়ে বাঁড়ুয্যে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "কে সেই সমালোচক শুনি?"

উত্তেজিতভাবে গোঁসাইজী বললেন—"কে সেই পণ্ডিত —বলতো হে—যিনি ডি, এল, রায়ের ভাষার দোষ ধরেন। বলুন না তিনি চেঁচিয়ে ওই কথা পাঁচজনে

সামনে, সকলে মিলে চাঁদা ক'রে চাটিয়ে তাঁর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।"

গোটা চার-পাঁচ পান একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে গুপ্তজা বল্‌লেন—"যাই বল—ডি, এল, রায় ছিল একটা খাঁটী Patriot। দেশের জন্য যার প্রাণ না কাঁদ্‌ল সে আবার কবি কিহে—মানুষ কিহে?"

ঠিক এই সময়ে একটি ১৬।১৭ বৎসরের ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে উপস্থিত হয়ে বল্‌ল—"আপনারা সকলে একবার বাইরে আসুন।"

গুপ্তজা বললেন—"কেন হে রমেশ, ব্যাপার কি?"

রমেশ বললে—"আপনাদের বাড়ীর ওদিকের ফুটপাতে একটা লোক পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে—বোধ হয় কলেরা হ'য়েছে।"

কলেরার নামে সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। গোঁসাইজী আর উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে বললেন—"তাই তো হে গুপ্তাজা, পাড়ায় কলেরা হ'চ্ছে নাকি?"

শ্যামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কি জাত? বাঙ্গালী—?"

ছোক্‌রাটি বলিল—"না, একজন হিন্দুস্থানী।"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গোঁসাইজী বল্‌লেন—"ও; মেড়ো—তাই বল। খেয়েছে ব্যাটা ছাতু লঙ্কা একপেট এখন তার মজা বেরুচ্ছে। ও ফুটপাতে তো—থাক্‌না পড়ে—সময় হ'লে মিউনিসিপ্যালিটী সরাবে।"

জীবনানন্দ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল,—"না না! সেকি কথা! মেড়ো হ'লেও মানুষ তো বটে। তোমরা ছেলে ছোকরা থাকতে ওর একটা ব্যবস্থা হয় না, রমেশ?"

কথাটা ব'লেই জীবনানন্দ একবার বিজয় গর্ব্বে গোঁসাইজীর মুখের দিকে চাইল। অর্থাৎ—ডি, এল রায়ের কথা নিয়ে বড় আমাকে কোণ-ঠেসা করেছিলে, এখন?

বিনীতভাবে রমেশ বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবস্থা আমরাই করব—কিন্তু আপনাদের একবার জানিয়ে গেলাম।"

গুপ্তজা বল্‌লেন—"নিশ্চয়ই জানাবে, পাঁচশ' বার জানাবে। তুমি ওর একটা ব্যবস্থা কর ভাই। তোমার ও সব আসে। ওর জন্যে যা দু'চার টাকা খরচ হয় আমরাই দেব।"

মিনিট-পনের পরে রোগীকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে গোটা-তিনেক টাকা আপাততঃ খরচার জন্য চেয়ে নিতে রমেশ পুনরায় সান্ধ্য বৈঠকে আসছিল। হঠাৎ একটা কথা কানে যাওয়াতে দোরের পাশেই দাঁড়িয়ে গেল।

গোঁসাইজীর কি-একটা কথার উত্তরে গুপ্তজা তখন বলছেন—"তুমিও যেমন ক্ষেপেছ! ও মেড়োটার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে গেল আরকি! ও ব্যাটা থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি? নিতান্ত বাড়ীর কাছে—বেজায় ছোঁয়াচে রোগ। চট ক'রে পরিষ্কার হ'য়ে যাবে—দু'চার টাকায় প্রাণটা বেঁচে যাবে। যাক্—মেলে দাও পাশার ছক্‌টা—দেখা যাক্ দু'হাত।"

শ্যামানন্দ বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভাল—এখন একটু অন্যমনস্ক হওয়া দরকার। কলেরার নাম শুনেই আমার পেটটা ভুট্‌-ভাট্ করতে শুরু ক'রেছে। কাল সকালেই ওলাবিবির পূজোটা পাঠিয়ে দিতে হবে।"

রমেশ যেমনি এসেছিল তেমনি ফিরে গেল।

সাহিত্য-সম্মিলন

যখন আমরা কোনো সত্যবস্তুকে পাই তাহাকে রক্ষণপালনের জন্য বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মানুষ করিবার জন্য মাতাকে গুরুর মন্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন গ্রহণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

বাঙালী একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ব স্বতই বাঙালীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয়, এমন আর কিছুই না। স্বদেশে বিদেশে আজ যেখানে বাঙালী আছে সেখানেই বাংলা সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে তাহার মতো অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কি আছে?

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের আপন নহে, উপার্জ্জন করিয়া যাহা পাই তাহাতেও আমাদের আংশিক অধিকার; নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্ম-প্রকাশ, তাহার পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। যে-দেশে আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্ব্বত্র আমাদের আত্মা আপন বহুধা শক্তিকে নানাবিভাগে নানারূপে সৃষ্টিকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার পরামর্শ এত উচ্চস্বরে এবং এমন নিষ্ফলভাবে দিতে হইত না। দেশে আমরা আত্মপ্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলা সাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন-কি, ইহা আমাদের নূতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে খাতে বহিত, বর্ত্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচারবিচার পুরাতনের নির্জ্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসঙ্গতির সীমা নাই, এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপন যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালীকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক্ হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্ব্বিচার অভ্যাসের দাসত্ব-পাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে জড় পুত্তলীর মতো হাজার বৎসরের দড়ির টানে বাঁধা কায়দায় চলা-ফেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যেই তাহার মন বে-পরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে, সেখানে সাহিত্যেই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবন-সমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে মানুষ বন্দী, বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক্ হইতে আমাদের মনের নাগপাশ-বন্ধন মোচন করুক; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক, তাহা হইলেই একদা কর্ম্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইন্ধনের নিজের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জ্বলিয়া ওঠে, পাথরের উপর বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে ক্ষণকালের জন্য তাতিয়া উঠে, কিন্তু সে জ্বলে না। বাংলা সাহিত্য বাঙালীর মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলিতেছে; ভিতরের দিক্ হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের দিকে জ্বলিবে, তখন ঝড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না, বরং বাড়িয়া উঠিবে।

এখনি বাংলা দেশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালী যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও জ্বলিয়া থাকে সে বাংলা দেশে, কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলা দেশে। ইহার অন্যান্য যে-কোনো কারণ থাক্, একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালীর অন্তরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য অনেক দিন হইতে অগ্নিসঞ্চয় করিতেছে,—তাহার চিত্তের ভিতর চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্ম্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজ-ক্ষেত্রেও বাঙালীই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ভোজন পংক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালীই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্ম্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ম্ময় বাহন সাহিত্যই সর্ব্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়াই আবহমান কাল সুর করিয়া পড়িয়া যাইত, মনের উদার সঞ্চরণের জন্য যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত, তবে তাহার মনের অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি হইয়া তাহাকে চিন্তায় ও কর্ম্মে সমান অচল করিয়া রাখিত।

মনে আছে আমাদের দেশের স্বাদেশিকতায় একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন বহুমূল্য হইয়া উঠিতেছে, দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে বাঙালীর মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে— সাধারণ দেশহিতের উদ্দেশেও বাঙালী এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অন্য কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্ত্তে বাঙালীর গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেশের ঐক্য ও মুক্তিকে যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা এম্নি করিয়াই ভাবেন। তাঁহারা এমনো মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন দেহগুলিকে কোনো মন্ত্রবলে একটিমাত্র প্রকাণ্ড দৈত্যদেহ করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটিবে না। শ্যামদেশের জোড়া যমজ যে দৈহিক শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চেয়ে জোর বেশি পায় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। নিজের দেহকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অন্য দেহধারীর সঙ্গে আমাদের যোগ একটা বন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলা ভাষাকে নির্ব্বাসিত করিয়া অন্য যে কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্ব্বল করা হইবে। সেই দুর্ব্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন, সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালীর চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায়, একথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জ্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মূঢ়তা। বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালীর মন যতই বড়ো হইবে, ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা মনের অপরিণতি ঘটে; যে অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না, সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলা দেশের কয়েকজন মুসলমান, বাঙালী-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা ৯৯য়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দ্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি? চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্য্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্ব্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্ব্বতা ঘটে যদি জবরদস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা হয় তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী, তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাতে তাঁহারা মুসলমানী মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলা ভাষার মধ্যে ত সেই উপাদানের কম্‌তি নাই—তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই ত। যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া হয়রান্ হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে? যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ৎ তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আল্লার দোওয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দু হৃদয় স্পর্শ করে না? হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ঝগড়া করিয়া যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই

ভালো হয়। বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষা-সাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনো চলে ?

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানী বাংলা, কেতাবী বাংলা নয়। স্কট্‌লণ্ডের চলতি ভাষাও ত কেতাবী ইংরেজী নয়, স্কটলণ্ড কেন, ইংলণ্ডের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজী নয়। কিন্তু তা লইয়া ত শিক্ষা-ব্যবহারে কোনো দিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক ভাষার বিশিষ্টতা থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়ম-বন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার-হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সাহিত্য খান্ খান্ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু দুই তরফের কেহই একথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অস্থ প্রশস্ত ক্ষেত্র আজো প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্‌কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তা'র পরে পলিটিক্‌স্ সত্য হইতে পারে। খানকতক বে-জোড় কাঠ লইয়া জোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়িরূপে ঐক্য লাভ করে একথা ঠিক নহে। খুব একটা খড়্‌খড়ে ঝড়্‌ঝড়ে গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্‌ও সেই রকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোয়ালে ছাপ্পরে চাকায় কোনোরকমের একটা সঙ্গতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলা দেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে-প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীক্-সাহিত্যে গ্রীক্ দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্ম্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান ছিলেন। তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান-আমলে আরবী ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারো জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব সাহিত্যে বাংলা দেশে যে একটি বিপুল মিলন-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর্য্যামীই জানেন তাঁহারা ধর্ম্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্ম্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু আশা করিতেছি তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমেই বলিয়াছি বাংলা দেশের সাধনা একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে ; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ব বোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসঙ্গত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইঁহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

প্রবাসী
বৈশাখ, ১৩৩৩ }

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু-মোস্‌লেম প্যাক্ট্

বঙ্গবাণী-সম্পাদক মহাশয়,

আপনি ত হুকুম দিয়ে গেলেন আমাকে বঙ্গবাণীর জন্য একটা প্রবন্ধ যা-হোক্ কোরে খাড়া করতেই হবে, কিন্তু আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি বীণাপাণির সেবা করার চেয়ে গদাপাণির সেবা করাই বেশী দরকার। প্রাণে যদি বাঁচি ত সাহিত্য-চর্চ্চটা দু'দিন পরেও হতে পারবে।

দেখেই ত গেছেন আমার বাড়ীটি একেবারে মুসলমান বস্তির মাঝখানে। এ কথাটার অর্থ যে কি তা আর এই দুর্দ্দিনে স্পষ্ট কোরে না বললেও চলবে। বস্তিতে যারা বাস করে তারা প্রায় সবাই রাজমিস্ত্রী অথবা মজুর। দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্যে এদের কাজ কর্ম্ম প্রায় বন্ধ, তবে সন্ধ্যার পর দেখতে পাই, সবাই লাঠি বা মশাল তৈরি করছে, কিংবা ছুরি ছোরা শাণাচ্ছে। সেদিন লাঠি তৈরি করবার সময় এদের নানারকম খোসগল্প হচ্ছিল। ভগলু সব-চেয়ে প্রাচীন। সে বল্লে—'আরে না না, কাবুল আসতে পারবে না ; ইংরেজ তাকে রুখে ফেলবে। তা ছাড়া কাবুল অনেক দূরে যে!' করিম বয়সে ছোট। সে জিজ্ঞাসা করলে—'আচ্ছা, নিজামের ফৌজ আসবে, শুনিছি যে। নিজাম এলেই হবে। তারপর হিন্দুদের একবার দেখে নেব!'

বস্তির ভেতর এই সব উচ্চ অঙ্গের রাজনীতির চর্চ্চা শুনে আমার কাণ খাড়া হয়ে উঠলো।

রেজাক একখানা ছোরায় শাণ দিচ্ছিল। সে বল্‌লে—'এই ইংরেজ শালারা যদি না থাকত, তা হলে সব বেটা হিঁদুকে ধরে গরু খাইয়ে দিতুম।' বুড়ী ফুলজানি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। হিঁদুদের গোরু খাওয়ানতে তার একটু আপত্তি দেখা গেল। বেচারা বোধ হয় ভাবলে যে সত্যি সত্যিই যদি এতগুলো মদ্দ পুরুষ হিঁদুদের গরু খাওয়াতে আরম্ভ করে, তাহলে গরু রাঁধতে রাঁধতে তাকে হায়রাণ হতে হবে। সে আস্তে আস্তে একটু প্রতিবাদ করে বল্‌লে—'আচ্ছা, গরু খেলেই যে মুসলমান হবে তার মানে কি? খৃষ্টানও ত হয়ে যেতে পারে!'

ভগলু তার জবাব দিলে। দেখলুম লোকটি শুধু প্রাচীন নয়, ধার্ম্মিকও বটে! সে বল্‌লে,—'গরু খাওয়াবার আগে কল্‌মা পড়িয়ে নিতে হবে।' করিম খুব খুসী হয়ে উঠলো। বল্‌লে—'ঠিক বলেছ বড় মিঞা; গরু খাবার পর বেটারা হয়ত গোবর খেয়ে পেরাচিত্তির করবে। কিন্তু কলমার আর কাটান নেই।'

লাঠি আর ছোরার সাহায্যে যারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের সংকল্প করছিল, তাদের সকলকেই আমি অনেকদিন থেকে চিনি। তারা কেউ লোক মন্দ নয়। সবাই আমার বাড়ীতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেছে। বুড়ী ফুলজানি আমার ছেলের অসুখের সময় নানা জায়গা খোঁজ করে ছাগল-দুধের জোগাড় করে দিয়েছে। ভগলু আমার একখানা বিশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়ে নিজে সেধে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ফুলজানির এক বিধবা বোন হজ করতে যাবার সময় তার সারা-জীবনের সঞ্চিত ৪২০টি টাকা আমারই কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। তখন তাদের কারও মনে পড়েনি যে আমি হিঁদু, সুতরাং কাফের। তারা যখন বেহেস্তে যাবে, তখন আমার সঙ্গে তাদের দেখা-শুনা হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আজ দাঙ্গা হাঙ্গামার পর মৌলভী সাহেব এসে তাদের সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছে; আর তারা সর্ব্ব কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ছোরা ছুরি শাণাতে লেগে গেছে। এখন শুধু একবার নিজামের ফৌজ এসে পড়লেই হয়!

নিজামের ফৌজ আসবার আগে ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে এরা যদি স্বপ্ন দেখে যে নিজাম বাহাদুর এসে হাজির হয়েছেন, আর ঘুমের ঘোরে এরা যদি ছুরি, ছোরা, মশাল, শাবল নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার করতে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে হয়ত এই কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আগামী মাস থেকে সৈয়দ মোহম্মদ ঘেঁচুউদ্দীন বা ঐ রকম একটা কিছু হয়ে যেতে হবে। তাতে বেশী দুঃখ নেই; দুঃখ শুধু এই যে জাতও যাবে, আর পেটও ভরবেনা। নবাবী আমল হলে হয়ত নাম বদলানর সঙ্গে সঙ্গে কালিয়া পোলাও কাবাবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যেতে পারতো; কিন্তু আজকাল ত সে দিন নেই। কিন্তু আমার নিজের দুর্গতি যাই হোক, এ কথা যখন ভাবি যে দু-তিন পুরুষ পরে আমারই বংশধরেরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফার্সিতে প্রমাণ করতে লেগে যাবে যে তাদের কোন এক পূর্ব্বপুরুষ নাদির সার সঙ্গে খোরাসান থেকে ভারতবিজয় করতে এসেছিলেন, যখন ভাবি যে হারুণ-উল-রশিদের নাম শুনে তাদের জিভ দিয়ে জল পড়বে, খলিফার দুঃখে তাদের ঘুম হবে না, 'শাতিল আরব' স্বাধীন করবার খেয়ালে তারা নিজেদের দেশের পরাধীনতা ভুলে যাবে, আর আমার ভায়েদের বংশধরদের কাফের মনে করে তাঁরা নাক সিঁটকাবে—তখন হেসে আর বাঁচিনে। তারা হয়ত বল্‌বে যে বাংলা তাদের মাতৃভাষাও নয়, পিতৃভাষাও নয়, চৌদ্দ পুরুষের কারও ভাষাই নয়; আর আঠারটা বোতাম-লাগান আংরাখা আর চুড়িদার পাজামার উপর প্রকাণ্ড একটা তুর্কি ফেজ উড়িয়ে প্রতিপন্ন করে দেবে যে বিশুদ্ধ আরবী বা তুর্কি রক্ত ছাড়া এক ফোটাও বাজে রক্ত তাদের শরীরে নেই!

এই সব ভেবে চিন্তে সে রাত্রে ত আর ঘুম হলো না। তার পর দিন তাড়াতাড়ি উঠে কংগ্রেস আফিসে খবর দিলুম। কংগ্রেসী কর্ত্তারা আশ্বাস দিলেন—'কিচ্ছু ভয় নেই; তাঁরা সব ঠিক করে দেবেন।' দন্তবিচ্ছেদ করে তাঁদের ধন্যবাদ দিলুম বটে, কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। কি জানি, বাবা, তাঁরা সব ঠিক করতে করতে এ দিকে সগোষ্ঠী আমি না ঠিক হয়ে যাই! কিন্তু না, কর্ত্তারা তাঁদের কথা ঠিক রেখেছেন দেখলুম। তাঁরা একটি মৌলভীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মুসলমান ভ্রাতাদের শান্ত করতে। মৌলভী সাহেবটি ধার্ম্মিক লোক; হজ করে ফিরে এসেছেন; তা ছাড়া সুন্নতের জোরে একটা স্বরাজী কারবারে একটি বড় চাকরীও জোগাড় করেছেন। সুতরাং ভাবলুম তিনি ধর্ম্মের খাতিরেই হোক, আর চাকরীর খাতিরেই হোক, ছোরা, ছুরি, মশালের একটা মীমাংসা করে দিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি মোটরে চড়ে বস্তির চারিদিকে বার দুই ঘুরপাক্ খেয়ে কোথায় যে সরে পড়লেন তার সন্ধান পেলুম না।

এ তো মহা বেগতিক! তা হলে কি এই বুড়ো বয়সে কাছা খুলে কলমা পড়তে হবে না কি? হয় ত বা তারও সময় থাকবে না, আগেই অগ্নিপক্ক হয়ে যেতে হবে।

ভাবতে ভাবতে প্রায় কাহিল হয়ে পড়বার জোগাড় হয়েছি, এমন সময় আমাদের পন্টু এসে উপস্থিত। হাতে একগাছি খেঁটে লাঠি, পরণে খাকির হাফ প্যান্ট। আমি বললুম—'পন্টু, এই খিলাফৎ কোম্পানীর জ্বালায় যে, রাত্রে ঘুমুবার জো নেই, তার কি ব্যবস্থা করি বল্ দেখি। এরা যে ক্রমাগত লাঠি তৈরি করছে আর ছোরা শাণাচ্ছে—দেখে ত আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। নেতারাও হার মেনে গেছে, পুলিসেও হার মেনে গেছে। এখন

তোরা যদি কিছু না করতে পারিস ত এ দেশ ছেড়ে পালাতে হয়!"

পন্টু একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—'আপনি প্যাক্ট চালাবার বন্দোবস্ত করছেন না কেন?'

আমার পিত্তি জ্বলে গেল। বল্লুম—'রক্ষে কর, বাবা; তোমাদের প্যাক্টের ফলেই এরা আস্কারা পেয়ে গেছে। ভাবছে, গায়ের জোরে যা খুসি তাই করবে। আজ বলছে শতকরা ৮০টা চাকরী আমাদের চাই, কাল হয় ত বলে বসবে শতকরা ৮০টা হিঁদুর মেয়ে আমাদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। নইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে ভোট দেব না।

পন্টু একটু হেসে বল্‌লে—'প্যাক্টের সবদিকটা আপনি ভেবে দেখেন নি, দেখছি। আসল প্যাক্টটা হচ্ছে সর্ব্বতোমুখী। সব বিষয়েই ওদের বেশী ভাগ দিতে হবে, তা না হলে বনিবনাও হবে না, এ কথা ত আমরা মেনেই নিয়েছি। এখন না বল্‌লে চলবে কেন? আমাদের মন্দির যদি ২০টা ভাঙ্গে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ৮০টা মসজিদ ভেঙ্গে পড়া চাই, আমাদের যদি ২০টা জখম হয় তাহলে ওদের জখম হওয়া চাই ৮০টা, তা না হলে ওদের ভাগে কম পড়বে; আর প্যাক্ট রক্ষা করা হলো না ভেবে ওরা চোটে যাবে। কিন্তু ওদের হিসাব যেমনি ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেবেন, অমনি ধাঁ করে মিল হয়ে যাবে।'

পন্টুর কথা শুনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। বল্লুম—'এ সব কি সর্ব্বনেশে কথা বলছিস পন্টু? এতে যে মারধোর বেড়েই চল্‌বে।'

পন্টু বল্‌লে—"আজ্ঞে না; প্যাক্টের উপর আপনার শ্রদ্ধা নেই বলেই আপনি ভয় পাচ্ছেন। বিশ্বাস না হয়, হাতে হাতে আপনাকে ফল দেখিয়ে দিচ্ছি।

পন্টু লাঠি নিয়ে বস্তির ভিতর ঢুকে পড়ল। আমার ভয় করতে লাগল, পাছে গোঁয়ার ছেলেটা না একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে!

আধ ঘন্টা পরে যখন পন্টু ফিরে এল, আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'কি পন্টু, কি করে এলি?'

পন্টু বল্‌লে—'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারেন। আমি করিম মিঞাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে বস্তি ছেড়ে লাঠালাঠি করতে বের হলে, ফিরে এসে বস্তি দেখতে পাবে না। করিম বুদ্ধিমান লোক, ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছে যে আমরা প্যাক্ট-পন্থী।'

তার পর থেকে নিজামের ফৌজ কত দূর এল, সে সংবাদ আর পাই নি!

বঙ্গবাণী
বৈশাখ, ১৩৩৩ } শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মোৎসবের দিনে

বাঁশি যখন থামবে ঘরে
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
নাইবা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো!
নাই ঘনালো দল বেদলের
কোলাহলের মোহ॥

আমি জানি, মনে মনে,
সেঁউতি যূথী জবা
আন্‌বে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।
বর্ষা শরৎ বসন্তেরি
প্রাঙ্গনেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরী
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন পরে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখীর কলরবে॥

জানি আমি এই বারতা
রটবে অরণ্যেতে—
ওদের সুরে কবির কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাগুন হাওয়ায় শ্রাবণ ধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে

উঠ্‌বে হঠাৎ বাজি ;
কভূ করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠবে জেগে
রঙীন বেশে সাজি !
স্মরণ সভার আসন আমার
সোণায় দেবে মাজি ॥

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরনীর ছায়া আলো
আমার এজীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশ-নীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে যে কুঁড়ির বুকে
ফুল ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুন চৈত্র রাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
ভাবীকালের হাতে ॥

আমার স্মৃতি থাক্‌না গাঁথা
আমার গীতি মাঝে,
যেথানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
মর্ম্মরিয়া বাজে।
যেথানে ঐ শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণ-কণা-মালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
করে কতই-কাজের খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি'
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি।

প্রবাসী
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ } শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তীর্থ-পাথিক

নিশি নিশি গণিকা-ভবনে
দুয়ার ঠেলিত এক পুরুষ-প্রবর,
দৃষ্টি তার পিপাসা-প্রখর,
অধর পাণ্ডুর তবু বিরস চুম্বনে !

তরুণী সে তন্বী রমণীর
গ্রীবায় বাহুতে বক্ষে, নীল ধমণীর
অতি সুক্ষ্ম বক্র রেখা পরে,
কম্পিত অঙ্গুলি তার অনুক্ষণ কেমন বিচরে !

বুকের সে মোমে-গড়া শুভ্র ছাঁচ দুটি
কি যেন পরখ-ছলে দেখিত সে খুঁটি'—
যেন সে খুঁজিছে কিবা আতিপাতি
রূপের সে রুদ্ধ কারাঘরে।

তারপর পরিশ্রান্ত বিফল সাধনে
টানিয়া লইত তারে সুকঠিন বাহুর বাঁধনে,
নেহারিত, নিজে নির্ব্বিকার—
স্বৈরিণীর সারা দেহে মদনের মূর্ত্ত অধিকার !

—নির্দ্দয় পীড়নে তার তনুতন্ত্রী শিহরে কেমন,
কণ্ঠে কিবা জাগে কুহরণ,
দুই গণ্ডে ফুটে ওঠে আবীর-কুঙ্কুম,
অলস নয়ন-তারা যেন ঘুম-ঘুম !—
নারী যত ভুঞ্জে রতি, তত সে পুরুষ
কত না ভ্রুকুটী করে, ভঙ্গী তার ততই পরুষ ;
উঠে যায় সম্ভোগের শেষে
রক্তহীন পাংশুমুখে, বুকে তবু জেগে রয় ক্ষুধা সর্ব্বনেশে !

তবু একদিন,
ফিরিয়া চলিতে পথে একটু সে আশা যেন ক্ষীণ
চমকিল চিত্তপ্রান্তে, ফিরিল পথিক
পুনঃ সেই দিক,
আবার হানিল কর নারীর দুয়ারে।

কাণে কাণে কহিল তাহারে—
যে-কথা পুরুষ-মুখে নারী কভু করেনি শ্রবণ !
শুনি সে প্রার্থনা
শয্যা ত্যজি' দাঁড়াইল ঘৃণ্য বারাঙ্গনা,
সহসা মুখের পরে নিক্ষেপিল দ্রুত নিষ্ঠীবন !

অমনি সে অতিথির নয়নে অধরে
আনন্দের সুধাস্নিগ্ধ হাসি নাহি ধরে!
এতদিনে সাঙ্গ বুঝি সুদীর্ঘ ভ্রমণ,
মিলিয়াছে দেব-দরশন!

নীরব ভাষায় শুধু তুলি' দুই হাত
নিবেদিল স্বস্তি-বাণী, ঊর্দ্ধলোকে করি' আঁখিপাত,
বেড়িয়া সে ললাট সহসা
প্রকাশিল জ্যোতিশ্ছটা বিদ্যুৎ-পরশা!

চাহিল না রমণী সে-মুখে,
তখনো সে উন্মাদিনী গালি দেয় নিদারুণ অবমান-দুখে।

কহিল গর্জ্জিয়া—
'সত্য বটে, দয়া-ধর্ম্ম লজ্জা বিসর্জ্জিয়া
এ দেহ করেছি পণ্য, তবু আমি নারী!

নহি তবু তোর মত পশু আমি, এত কদাচারী—!'
পুরুষ কহিল ধীরে, স্নিগ্ধস্বরে,—
'আমি চির সত্যের ভিখারী।'

(মার্কিণ-কবি George Sylvester Viereck এর অনুসরণে)

উত্তরা
বৈশাখ, ১৩৩৩ } শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

নমো নমো নমো

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

নমো নমো নমো
অপরূপ অনির্ব্বচনীয়!
নমো নমো নামো!

দেহের বীণাতে ওঠে ঝঙ্কারিয়া সুরের প্রণতি
নমো নমো নমো

নয় বাণী নয় স্তুতি নহেক প্রার্থনা
গান নয় নয় আরাধনা
শুধু দেহ-দীপ হতে ওঠে শিখা সম
নমো নমো নমো!

সব অর্থ ডুবে যায় আনন্দের অতল সাগরে—
শুধু অহৈতুক
অর্থহীন
নমো নমো নমো !
দুর্বোধ প্রাণের ভাষা
বাণীর আরতি !

চেতনা হারায়ে যায় অনন্তের অপার পাথারে
সেথা হ'তে ওঠে শুধু
বাঙ্ময় অর্চ্চনা,
নমো নমো নমো

পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্ফুটিত পদ্ম হ'তে ওঠে গন্ধসম
নমো নমো নমো !

কথা খুঁজে নাহি মিলে, বিস্ময়ের রহে নাক সীমা—
আনন্দের ঝটিকায় কাঁপে প্রাণ স্পন্দমান তারকার মত—
বিরাটের তীরে তীরে জীবন কল্লোলি ওঠে—
নমো নমো নমো !

নমো নমো নমো !
প্রণামের বিরাট আকাশে
সব গান ডুবে আছে মিলে আছে সব পূজা
হারাইয়া আছে স্তুতি সকল আরতি
সমস্ত সাধনা
কোটি কোটি তারকার মত।

মহা নীলাকাশ সম
মূর্ত্তিমান সীমাহীন
নমো নমো নমো !

পোণাঘাট পেরিয়ে—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

রোগা লম্বা শাল্‌তিগুলি আসে, খড়, ধান, চালের বোঝাই নিয়ে নড়ালের পোলের তলা দিয়ে—দক্ষিণ থেকে। নোণা দেশের মিশ্‌ কালো চাষী বাঁশের লম্বা লগি বায়; দরমার ছাউনির তলায় উনুনে ভাত ফোটে।

উত্তর থেকে আসে হাঁড়ি, টালি, বালি, ইট, গুড়ের বোঝাই নিয়ে মহাজনী নৌকা।

নদী মরে এসেছে। এককালে গাধাবোটেও আপত্তি ছিল না, আজকাল জোয়ারের সময় বড়জোর বিশমাল্লা পর্য্যন্ত চলে। ভাঁটায় শুধু শাল্‌তি।

* * * *

এখানে নদীটির অত্যন্ত দৈন্য দশা। শীতকালে ভাঁটার সময় হাঁটু পর্য্যন্ত জল ওঠে কিনা সন্দেহ।

* * * *

হালদার কোম্পানীর চালান-সরকার বিদেশী লোক, নতুন কাজে বাহাল হয়েছে, সেদিন সে কাকে বলেছিল, "খালের জল যা ঘোলা, নাইতি পারবা না।"

"খাল! খাল! তোমার নানা কাটিয়েছিল"—বুড়ো সরকার-মশায় দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন—"এই খালের এক ফোঁটা জল পেলে তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়! খাল! ডোবা!"

"আমার খুশী, আমি একশ'বার খাল বলব। আপনার কি!"

"আমার কচু! তুমি নর্দ্দমা বল না, মা গঙ্গার মুখে থুতু দাও না!"

—এমন তাদের রোজই হয় ছোট-খাট জিনিষ নিয়ে। বুড়ো সরকারের বকাটে ঘর-জামাইটা গোলায় গোলায় চেলে গাঁজা-ভাঙ টেনে দিন কাটায়।

সরকার-মশাই বলেন, "তার ত একটা হিল্লে হয়ে গেছল ওই বেটা না উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লে।"

কথাটা ষোলআনা সত্য নয়। জামাইকে বলেকয়ে তিনি কাজে লাগিয়ে একরকম দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন মুখার্জ্জি-কোম্পানির সরকার এসে হট্টগোল বাধিয়ে দিলে। "সকাল থেকে মাল নেই; তিনশ' মিস্ত্রি বেকার বসে আছে, ছুকেরা সুরকি মুটের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন! বলিহারি আপনাদের আক্কেল! কে এখন গুণগার দেবে শুনি!"

সত্যিই গুরুতর ব্যাপার!

"গাড়োয়ানরা ত অনেকক্ষণ মাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে, এতক্ষণ ফিরে আসবার কথা!"—খোদ কর্ত্তা গদি থেকে বিপুল দেহভার তুলে উদ্বেগে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন।

মুখার্জ্জি-কোম্পানি বড় খদ্দের!

শেতল মোড়ল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বল্লে, "আজ্ঞে, আমি ত শুধু ছুকেরা সুরকি চেয়েছিলাম!"

"তারপর?"

"পঁচিশ গাড়ী সুরকি নিয়ে আমি কি আমার গোরে চাপা দেব।"

বুড়ো সরকারের বকাটে জামাই তখন নির্ব্বিকার মুখে চালান লিখে চলেছে।

খোদ কর্ত্তা হাঁকলেন, "কে, চালান সই করেছে কে?"

"আজ্ঞে আমি!"—

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়—একই রাস্তার নম্বরগুলো একটু ওলট্‌পালট্ হয়ে গেছে। অমন ভুল ত হ'তেই পারে।

বুড়ো সরকার-মশাইএর চোখ ফেটে জল বেরোয় আর কি!

তাঁর জামাই কিন্তু অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল থেকে তাহ'লে আর আসতে হবে না?"

"না।"

"আর পরশু?"

"না, না।"

"আজ্ঞে কোনদিন যদি দরকার বোধ করেন ডাক দিলেই আমি আসব, জানেন ত ওই গুলিখোরের ঘাট।"

ছ'জোড়া রোষরক্ত চোখের সামনে দিয়ে আর কেউ অমন অবিচলিত ভাবে বেরিয়ে আসতে পারত না বোধ হয়! কিন্তু বলাইএর কাঠামই আলাদা।

আর চাকরীর বালাই নেই। নির্ভাবনায় বলাই ঘুরে বেড়ায়। সরকারমশাই বলেছেন, "মুখ দেখতে চাই না।" মুখ দেখবার চেষ্টা করলেও তিনি সফল হতেন বলে মনে হয় না—সে সুযোগ মেলা ভার।

শাশুড়ি ঝণাৎ করে ভাতের থালাটা নামিয়ে দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে ঘরে গিয়ে ঢোকেন। বলাই নির্ব্বিকার মুখে থালাটি নিঃশেষ করে উঠে যেতে যেতে বলে, "ডালটা যা হয়েছে, অমৃত!"

বুড়ো সরকারের ষোড়শী কন্যা ভ্রূকুটি করে মনে মনে বলে, "মরণ আর কি!"

শাশুড়ি গলা ছেড়েই বলে, "চোদ্দ পো অধর্ম্ম না করলে এমন জামাই হয়! ওঁর ভীমরতি ধরেছিল, নইলে রাজ্যে আর পাত্তর ছিল না।"

বলাই একটু মুচ্‌কে হাসে; তাচ্ছিল্যভরে দেওয়া পানটা বৌএর হাত থেকে নিয়ে বলে, "একটু চুণ!" তারপর একটু থেমে বলে, "সঙ্গে না হয় একটু কালিও দিও!"

চপলা ভুরুকুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

* * * *

এবছর বাজার বড় মন্দা, নদীতে দাঁড়ের ঘা পড়ে না। দক্ষিণ থেকে দুটি একটি শাল্‌তি কখন-বা আসে, লগি বেয়ে—, উত্তরের কুদ্‌ঘাটায় কেরাণী নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়—

"হ্যাঁ বাবা পেটো, বেশ করে বেড়োন্ দাও, নইলে অত আয়েশ সইবে কেন? ফুলে মরে যাবে যে! গতরে ঘুণ ধরে যাবে! কাজ যেমন নেই, রোজ সময় করে একটু একটু বেড়ন দিচ্ছ ত?"

মেহরারু বলদটাকে রেহাই দিয়ে বল্লে—"নেহি বোলাই বাবু, এ বলদটো ভারী বদমাস আছে, ইহার লিয়ে হামার বিলকুল লোকসান হয়ে গেলো। আর সব বলদ হামার নাল বাঁধাতে লাগে দু আনা, আর ই-শালার খালি গিরাই লাগে একটাকা! তারপর নয়া রশ্‌শি—উভি দশ আনার কমতি নেই!"

অনেকগুলো গরুর গাড়ি ল্যাজ তুলে অতিকায় ফড়িঙের মত পড়ে ছিল। তারি একটায় বেশ আয়েস করে বসে বলাই বল্লে—"তেমনি একটি বছরের মত যে থালাস বাবা! দুষ্টু গরুর সুখ ত ওই! ক্ষুর কখন পাৎলা হবে না, ও আট দিন অন্তর নাল বাঁধাবার হ্যাঙ্গাম নেই!"

ওসমান কাছেই বসে জীয়ুতের ভঁইষের নাল বাঁধছিল। লোহার নালে একটা গজাল ঠুকে বল্লে, "ঠিক বলেছেন বাবু! আমি এই বিশ বছর নাল বাঁধছি, একটা দুষ্‌মন গরুর পাৎলা ক্ষুর দেখলাম না।"

"কিন্তু এত নাল বাঁধা-বাঁধিই বা কিসের রে বাপু! বসে বসে গাড়ি হাঁকাতে ত বোধ হয় ভুলেই গেলি! বলদগুলো কি আজকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাল খোয়াচ্ছে, না সুরকি পটির নসীব ফিরল?"

জীয়ুৎ দুটি বিড়ি বার করে, একটা বলাইএর দিকে এগিয়ে ধরল—"কাঁহা নসীব বাবু, কৌনো গোলামেঁ

বিক্রি উক্রি কুছু নাহি বা, আজ্ ছ রোজ হমার একুগো থেপ মিলল ন।"

নাল বাঁধা শেষ হয়ে গেছল। ওসমান মোষের পা থেকে দড়িটা খুলে নিতে নিতে বল্লে—"সত্যি এবছর বাজার এত ঢিলে কেন বলুন ত বলাই বাবু—?"

মুখ থেকে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলাই বল্লে, "সহরে কি আর টাকা আছে রে বাপু, যে লোকে বাড়ি করবে!"

খানিক থেমে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলাই আবার বল্লে, "একটাকার নোট বেরিয়েছে দেখেছিস্?"

"হাঁ, দেখেছে!"—মেহ্‌রারু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলাই তাকে বাধা দিলে, "খালি কাগজ! ওই কাগজ দিয়ে ভুলিয়ে সব টাকা বিলেতে চালান করে দিচ্ছে তা জানিস্?"

এ খবরটা তারা কেউ জানত না বটে স্বীকার করলে।

"টাকা এদেশে থাকলে ত লোকে বাড়ি করবে! সব টাকাই যে বিলেতে!"

তিন জনেই মাথা নেড়ে জানালে—ঠিক কথা বটে—বলাই বাবু ধরেছেন ঠিক,—"আচ্ছা, বিলেতে টাকা পাঠাচ্ছে কেন?"

"কেন? আবার যে যুদ্ধ বাধবে রে!"

"ফিন্ লড়াই!"

বলাই গরুর গাড়িটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বল্লে, "তবে আর বলছি কি? সুরকি-পটির এমন হাল কখন দেখেছিস্? গরুর গাড়ির ভিড়ে সুরকি-পটিতে লোক চলতে পারত না, দুমাস অন্তর রোলার ইঞ্জিন আসত রাস্তা মেরামত করতে! আর এখন?"

"আমি আর থাদেম এরাস্তার নাল বেঁধে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না বাবু"—ওসমান কথাটাকে শেষ করতে পারল না।

মেহ্‌রারু নদীর দিকে মুখ করে বসেছিল, উল্লসিত হয়ে হাঁকলে, "উ নাও আছে না কি আছে বোলাই বাবু? দেখেন ফিরে!"

বিস্ময়ের কথাইত! পোণাঘাটের বাঁকের মাথায় ইটের ভরা দেখা দিয়েছে!

একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচ পাঁচটি ইটের ভরা গোণা-ঘাটের বাঁকের মাথায় পর পর দেখা দিল। বলাই হাঁকলে, "কোন ঘাটে বাঁধবে মাঝির পো?"

হালীর মাচা থেকে উত্তর এল, "হালদারদের গো হালদারদের!"

তা হালদারদের ছাড়া আর কাদেরই বা হওয়া সম্ভব!

রাস্তায় যেতে যেতে একটি লোক থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বল্লে? হালদারদের না?"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একটু হাসল মাত্র। উত্তর দিলে না। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলাইএর দিকে বিষদৃষ্টি হেনে চলে গেল।—একটু যেন খুঁড়িয়ে!

"খোঁড়া-বাবুর চোখ টাটাচ্ছে!" ওসমান হাসতে লাগল।

খোঁড়া বাবুর সঙ্গে হালদার-কোম্পানির সতাসতীন সম্পর্ক। কার সঙ্গেই বা নয়?

সুরকিপটিতে সাড়া পড়ে গেছে।

গরুর গাড়িটার উপর বলাই চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। একে একে দুজন সরে পড়েছে। প্রথমে গেল জীয়ৎ—তার দামাদ আসবে, তাকে সওদা করতে যেতে হবে।

জীয়ৎ যেতে না যেতে মুখ বেঁকিয়ে মেহ্‌রারু জানালে জামাই এসেছে না আরো কিছু—ও শুধু থেপ্ মাংতে যাওয়া তা আর কে না বুঝতে পারে; অত ছোট মেহ্‌রারু হতে পারে না। আপন খুশীতে থেপ কেউ দেয়, বহুত আচ্ছা! নইলে থেপ্ পাবার জন্যে উমেদারী করতে হবে? আবার ভরা ঘাটে না লাগতে লাগতে,—ছোঃ—!

মেহরারুকেও কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। নড়ালের পোল পেরিয়ে একবার নূতন চাক্কাটার কি হ'ল খোঁজ করতে যেতে হবে।

আজ সবারই দরকার নড়ালের পোলের দিকে !

খানিক চুপ করে থেকে চোখ বুজেই বলাই বল্লে, "ওসমান আছিস্ !"

"হাঁ বাবু !"

"চুপি চুপি তুপুঁটলি নিয়ে আয় দেখি ।"

ওসমান আপত্তি করে বল্লে, "না না বাবু, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে, ঘরে যান, সরকারমশাই আবার রাগ করবেন ।"

মুদিত চোখেই হাত নেড়ে বলাই বল্লে, "বাজে কথা ফেলে তুই যা দেখি, তুটি পুঁটুলি আর আধসের রাবড়ি, বুঝেছিস্ ? আমি ওই গুলিখোরের ঘাটে আছি ।"

খানিক ওসমানকে নীরব দেখে বলাই বল্লে, "ঘাটে পাঁচ-পাঁচটা ভরা লেগেছে আবার ভাবনা ? যা যা থপ্ করে আয় !"

"আজ্ঞে না বাবু, ভৌজি আপনার জন্মে বসে থাকবে— ।"

বলাই একটু হেসে বল্লে—"রাবড়িটা একটু লুকিয়ে আনিস্ ।"

অগত্যা ওসমান গেল ।

বেলা বেশ বেড়ে গেছে । জীয়ুতের মোষটা নিজে নিজেই গিয়ে নদীতে নামল । কিন্তু বলাইএর ভ্রুক্ষেপ নেই । গরুর-গাড়িটার ওপর তেমনি ভাবেই এই প্রচণ্ড রোদে এলো গায়ে সে পড়ে রইল ।

কিন্তু বেশীক্ষণ পড়ে থাকা গেল না ।

পায়ে সুড়্সুড়ি লাগতেই চমকে ঘুম ভেঙে গেল । "—ফের এসেছিস্ ছুটকি ! আজ তোর বাবাকে বলে দেবই !—দেখ্ তা'হলে !"

কিন্তু ছুটকি সে কথা শুনতে পায় কেমন করে ! সে ত তখন তার নতুন রঙীন ডোরদার স্যাড়ী বাঁচিয়ে গোবর কুড়োতে অত্যন্ত ব্যস্ত !

খোঁড়া-বাবু আবার ফিরছিল । দাঁড়িয়ে পড়ল । দাঁতে দাঁত চেপে কি একটা উদ্যত কথাকে সে দমন করলে তাও বোঝা গেল । বলাই কিন্তু তার ভ্রূকুটিকুটিল অগ্নিদৃষ্টির প্রত্যুত্তরে একটু হেসে বল্লে, "বড়ি পিয়াস্ লাগল্ এ ছুট্কি, তনি মেহেরবানি করি কি ন ।"

খোঁড়া বাবু এতখানিই বা সহ্য কেমন করে' করে !

ছুটকি আবার ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে—মুখে কাপড় দিয়ে দুষ্ট হাসিটুকু লুকোবার ভাণ করে ।

রাত অনেক হয়ে গেছে ।

বলাই পা টিপে টিপে ঘরে গিয়ে ঢোকে । চপলা বই পড়ায় ব্যস্ত, ফিরেও তাকায় না । বলাই চুপ করে দাঁড়িয়ে খানিক্ আড়চোখে দেখে, তারপর থপ্ করে পাশে বসে পড়ে, বইটা হাত থেকে কেড়ে নেয় । ঝট্কা দিয়ে বইটা আবার ছিনিয়ে নিয়ে—চপলা রুক্ষস্বরে বলে—"ও আবার কি ন্যাকাপণা ! সরে বোস । ওসব গাঁজা-গুলির গন্ধ আমার সয় না !"

বলাই ভুরু দুটো তুলে একটু মুচকে হাসে । বলে,— "মাইরি আজ মুখ শুঁকে দেখ, খাসা কচি আমের গন্ধ না পাও ত আমায় দূর করে দিও । তোমার জন্মেই শেষটা গাঁজা ছেড়ে চরস ধর্তে হ'ল ।"

চপলা উত্তর দেয় না । বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে । তারপর আপনমনেই বলে, "মুখ নাড়তে লজ্জা করে না ? মানের ত একে সীমে নেই— গাড়োয়ান ইয়ার, ঠিকাদার ইয়ার, গরুর নাল বাঁধে যে মোছলমান, সেও ইয়ার । তাও না হয় হ'ল । শেষটা বামুনের ছেলে হয়ে কৈবর্ত্তর ঘাড়ধাক্কা খাওয়া । কোন্ মুখে সে আবার লোকসমাজে বেরোয়—দাঁত বের করে কথা ক'য় ! দু'কানকাটা বেহায়া ! দড়ি কলসি জোটে না !"

কথাটা মিথ্যে নয় ।

কদিন ধরেই খোঁড়াবাবু প্রতিশোধ নেবার তক্কে ছিল । সুযোগও মিলতে দেরী হল না । কবে থেকে

খোঁড়াবাবু গুলিখোরের ঘাট আবার জমা নিয়েছে তা কে জানে। দুপুরে বলাই রোজকার মতই শিষ্য-সাকৃরেদ সমেত মৌতাতের আড্ডাটি জমিয়েছে, এমন সময় দরওয়ান সমেত খোঁড়া বাবু এসে হাজির। তারপর বেপরোয়া ঘাড় ধাক্কা। মৌতাত তখন বেশ জমে উঠেছে। শান্ত সুবোধ ছেলের মত সবাই বেরিয়ে এল।

ওসমান ছিল না। এসে শুনে বল্লে, "এইবার হাতে হাঁটুতে হবে, ঠেঙোর বয়না দিতে বলে আসি খোঁড়া বাবুকে।"

বলাই হেসে বল্লে, "তা'হলে এতদিন ধরে ছাই নেশা করেছিস্। রক্ত যদি গরমই হ'ল তবে আর মানুষের বার হলি কোথায়?"

ব্যাপারটা ওই খানেই থেমে আছে।

চপলা কথাগুলো বলে পাশ ফিরে শোয়। তারপর খানিক্ সব চুপ চাপ। পূবের জানালা দিয়ে যে সামান্য গ্যাসের আলোটুকু আসে তাতে কেউ কাউকে দেখতে পায় না।

পেলে বোধহয় ভাল হ'ত।

বলাই বিছানার ধারে এসে বলে, "মাইরি, রাত্রে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এখন দড়িও পাব না কলসিও না। রাতটুকুর মত একটু সরে শুতে দাও।"

চপলা বিছানা থেকে নেমে মেজেতে আঁচল পেতে শোয়। বলাই বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় উঠে শোয়, খানিক্ এপাশ-ওপাশ করে, তারপর বলে, "উ, বেজায় গরম, ঘাটে যেতে হ'ল।"

বলাই বেরিয়ে যায়। চপলা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

কদিন ধরে খোঁড়াবাবুর খিলে-ডিঙিটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাজ্জব ব্যাপার!

কেউ বলে—"কুদ্‌ঘাটার গজের মধ্যে আট্‌কে আছে দেখে এলাম।"

কেউ বলে—"উঁহু, সে ত দেখলাম—"

সরকার-মশাইএর জামাইএরও নাকি কদিন ধরে পাত্তা নেই—।

* * *
* *
*

ঘটির কাণায় লেগে শাঁখা-গাছটা গেল ভেঙে।

মা বল্লে, "যাবে না? অত থর-থরে হলে যাবে না! ভাঙল ত এই বেস্পতি বারটায়?"

চপলা আর-একটা শাঁখা সজোরে আছড়ে ভেঙে বল্লে, "ভাঙুক—; ভাঙুক, সব ভাঙুক! সব যাক!"

মা গালে হাত দিয়ে চোখ কপালে তুলে বল্লে, "ওমা, কি হবে গো! কি অলুক্ষুণে পোড়া-কপালি মেয়ে গো! এইস্ত্রী-মানুষ শাঁখা দুটো ঠুকে ঠুকে ভাঙলেগা এই বেস্পতি বারে!"

চপলা দুম্ দুম্ করে ঘরে গিয়ে ঢুকে খিল দিয়ে বল্লে, "ভেঙেছেই ত, কপাল ত' পুড়েইছে! আমার হাড়ও জুড়িয়েছে, তোমরাও নিশ্চিন্তি হয়েছ। এক মাস ধরে একটা মানুষের কি আর অমনি খবর মেলে না! আছে কোন্ আঘাটায় আট্‌কে এতক্ষণ দেখগে যাও! আর দেখবারই বা কার দায় পড়েছে! শ্যাল্ কুকুর বইত নয়!"

* * *

খবর মিল্‌ল।

কোমরে দড়ি দিয়ে পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে এল। খিলে-ডিঙি সমেত বলাই নড়ালের পোলের তলাতেই এসে হাজির! "বলিহারি সাহস!"—বুড়ো সরকার-মশাই গিয়ে বল্লেন, "আমি বামুন হয়ে তোমার হাতে পৈতে জড়িয়ে মিনতি করছি বাবা, এবারটা মাপ্ করো।"

খোঁড়াবাবু অত নরম মাটি নয়! অত সহজে সেখানে দাগ বসে না। বল্লে, "বিস্তর সয়েছি মশাই! আপনার

জামাই, আর ভদ্রলোকের ছেলে বলে' বিস্তর সয়েছি! এ সুরকি পটির কলঙ্ক!"

"তাত স্বীকার যাচ্ছি বাবা, তবে তোমরা যদি না মাফ্ কর তাহ'লে করবে কে? তোমরা হ'লে এ পটির মাথা।"

খোঁড়াবাবু বলাইএর দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে বল্লে, "কিন্তু মাথাও মাঝে-মাঝে গরম হয়। বাছাধন পীরের সঙ্গে মাম্‌দোবাজি করতে গেছলেন যে!"

বলাই তখন পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছে,— "সাহেব, তোমাদের মুলুকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নেশাটা আশ্‌টা চল্‌বে ত? নইলে বাবা ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে!"

কথাটা জোরেই বলা হয়েছিল। সবাই শুনতে পেল্।

খোঁড়াবাবু সরকার-মশাইএর হাতটায় একটা টান দিয়ে বল্লে, "শুনলেন ত'—গাঁজলা এখনও মরেনি। না মশাই, আমি কিছু পারব না।"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে খোঁড়াবাবু পারল। খোঁড়াবাবু দয়ালু ব'লে দুর্নাম পটিতে নেই। কিছু বোঝা গেল না।

* * *

বলাই বলে, "তোমার বাবাই ত সব মাটি করলে, ছেলেবেলায় পড়াশুনায় ভালো ছিলাম, সবাই বলত জলপানি পাব, তা অতদূর আর দেখবার ফুরসুৎ হয়নি; এবার ভাবলাম এতদিনে বুঝি ভবিষ্যদ্‌বাণীটা ফলে গেল, সরকারের টাকাটা সৎপাত্রে পড়্‌ল, তা তোমার বাবা হতে দিলে কি?"—রসিকতাটা ভাল জমে না। বলাই নিজেই হো হো করে হাসে। হাসিটাও যেন কেমন মনমরা। বলাইএর হোল কি?

চপলা কথা কয় না। বলাই আবার বলে,—"বিদেশে একটা চাকরি পাচ্ছি, যেতে বল ত যাই—?"

"যমের বাড়ি একটা চাকরি মেলে না?"—চপলা তেমনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

"মিলতে পারে, দরখাস্ত করে দেখিনি।"

বলাই বেরিয়ে যায়।

* * *

—ওসমান বলে, "সে কি আর এখানে আছে বাবু, যে তাকে দেখতে পাবেন! ছুট্‌কিকে এখন পায় কে?"

বলাই জিজ্ঞাসা করে, —"তার মানে?"

"খোঁড়াবাবু তাকে মাসোহারা দেয় ত্রিশ টাকা— তার বাপকে দেয় দশ। তা ছাড়া নগদ কত দিয়েছে কে জানে!"

"আক্‌লু রাজী হ'ল?"

ওসমান হাতের টাকাটা দুবার বাজিয়ে বলে,— "দুনিয়া গোলাম—"

বলাই খানিকক্ষণ কি ভাবে—তারপর বলে, "হাঁ, খোঁড়াবাবু নতুন খড়ের গোলা খুল্‌ল।"

'খুল্‌বে না? পটির সবাইকে কাণা করে দিলে রাবিশে আর ঘুষে। মুখার্জ্জি-কোম্পানির মাল কোথা থেকে যাচ্ছে! চারটে লরীর ঠেলায় রাস্তা থর-থর করছে রাতদিন!'

বলাই বলে, "বহুৎ আচ্ছা, চল্।"

চোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে ওসমান বলে, "কোথায় বাবু?"

"খোঁড়াবাবুকে সেলাম দিতে।"

* * *

ওসমান ধরে রাখতে পারছিল না, কাতর হয়ে বল্লে, "বাবু, বড্ড বেসামাল হয়ে পড়েছেন, রাতও অনেক হ'ল, ইদিকে নয়—বাড়ি চলুন।"

বলাই তার হাতটা ধরে টানতে টানতে বলে, "চুপ, নড়ালের পোল আর কতদূর বল্—"

"ওই ত দেখা যাচ্ছে বাবু! ঘরে চলুন বাবু, রাত ছুটো হ'ল।"

"তবে তুই যা!"—বলাই তার হাতটা ছেড়ে দিলে, কিন্তু নিজে টাল না সামলাতে পেরে হোঁচট্ খেয়ে পড়ল। ওসমান নিজেও বেশ টল্‌ছিল, তবু কোনরকমে ধরে' তুলে আবার মিনতি করে বল্লে, "কোথায় চলেছেন বাবু?"

"এইটে খোঁড়াবাবুর নতুন গোলা, না?"—বলাই থম্‌কে দাঁড়াল। ওসমান তাকে ধরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "হাঁ বাবু!"

সমস্ত পটি নিস্তব্ধ। নড়ালের পোলের আলোগুলো নদীর স্থির জলে পড়ে ঝিক্ ঝিক্ কর্‌ছিল।

"ফটকের তালা ভাঙতে পারবি?"

ওসমান বলাইএর চোখের দিকে চাইল, অন্ধকারে দেখা যায় না। বল্লে,—"বাবু, বাড়ি চলুন!"

"পারবি কি না বল!"

অনেকক্ষণ পরে উত্তর এল,—"পারব।"

তালা ভাঙা হ'ল। পকেটের বোতলটা বার করে নিঃশেষ করে তেলটা ঢেলে বলাই বল্লে, "দে দেশলাইটা—"

... ...

... .

লোকে লোকারণ্য! তিনটে দমকলে আগুন সামলাতে পারছিল না। আকাশ যেন তেতে রাঙা হ'য়ে উঠেছে। পোণাঘাট ছাড়িয়ে কেঠোপটি পর্য্যন্ত বাতাসে পোড়া খড়ের গন্ধ আর উড়ো ছাই!

ওসমানের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে যেতে বলাই বল্লে,—"দেখ্‌লি সেলাম? নেশাখোর মানুষ—আমাদের রাগ করতে নেই, তবে আমাদের সেলাম এমনি!"

কারা বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছিল, "আহা, গরীব বেচারা গো, সর্ব্বস্ব দিয়ে গোলাটি করেছিল।"

"গরীব বল্লে হবে কি বাপু! বেহ্মশাপ! মহাপাতক না হলে অগ্নিদেব দেখা দেন না।"

"তোমার মাথা! পাশেই খোঁড়ার গোলাটা তাহ'লে রয়েছে কি করতে! যত মহাপাতক করেছিল ঐ নিরীহ গরীব বেচারী!"

বলাইএর কানে কোন কথাই যায় না।

পতিতা

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

আগার তাহার বিভীষিকা-ভরা, জীবন মরণময়!
সমাজের বুকে অভিশাপ সে যে, সে যে ব্যাধি সে যে ক্ষয়;
প্রেমের পসরা ভেঙে ফেলে দিয়ে ছলনার কারাগার
রচিয়াছে সে যে,—দিনের বেলায় রুদ্ধ করেছে দ্বার!
সূর্য্যকিরণ চকিতে নিভায়ে সাজিয়াছে নিশাচর,
কালনাগিনীর ফণার মতন নাচে সে বুকের পর!

চক্ষে তাহার কালকূট ঝরে,—বিষপঙ্কিল শ্বাস,
সারাটি জীবন মরীচিকা তার,—প্রহসন, পরিহাস!
ছোঁয়াচে তাহার ম্লান হয়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা!
সে যে মন্বন্তর,—মৃত্যুর দূত,—অপঘাত,—মহামারী,
মানুষ তবু সে,—তার চেয়ে বড়,—সে যে নারী, সে যে নারী!

ইয়োহান বোয়েরের The Great Hunger হইতে—

প্রিয় ক্লস্ ব্রক্,

এখানে সম্প্রতি আমাদের কি ঘটেছে তাই বলবার জন্ম তোমায় এই চিঠি লিখচি, বিশেষত এই আশা করে' যে এতে হয় ত তুমি কতকটা সান্ত্বনা পাবে। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি ভাই যে আমাদের এই যে বিশ্ব-বেদনা, এঁকে মানুষ জয় করতে পারে কেবল এক উপায়ে—যদি সে সব জিনিষ অপরের চোখ দিয়ে না দেখে নিজের চোখে দেখতে শেখে।

বেশীর ভাগ লোকে বলবে যে আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে আরও-খারাপ হয়ে চলেচে। আর আমিও নিশ্চয়ই দুঃখকে দুঃখেরই জন্ম ভালবাসি ব'লে ভাণ করবো না। বরং বলব দুঃখ আঘাত দেয়। দুঃখ মহৎ করে' তোলে না, বরং এ মানুষকে পশুই করে' ফেলে, যদি না এই দুঃখই আবার সর্ব্ববস্তুকে নিজের মধ্যে টেনে নেবার মত বৃহৎ হয়ে ওঠে! এক সময় আমি কার্ষ্ট ক্যাটারাক্ট-এ ইঞ্জিনিয়ার-ইন্-চার্জ্জ ছিলাম,—আর আজ সেই-আমিই একজন গ্রাম্য কামার। এতে কষ্ট হয়। চোখ খারাপ ব'লে লেখাপড়া থেকে আমি বিচ্ছিন্ন; যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে' আনন্দ পেতাম, তেমন ধারা একটি লোকও এখানে নেই, কাজেই এদিক্ দিয়েও আমি বঞ্চিত। অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এই সমস্ত মনকে পীড়া দেয়,—ভাল বলবার মত এ'সবের মধ্যে কিছুই নেই। অনেকবারই আমি ভেবেচি যে দুরবস্থার ঢালু গড়িয়ে বুঝি একেবারে তলায় এসে পৌছলুম, কিন্তু প্রত্যেকবার দেখলাম যে সে-শুধু একটা ক্ষণিক বিরাম মাত্র। অতল গভীরে আসা তখনও বাকী ছিল। ধর,—মাথাটা ফেটে যাবে মনে হচ্চে, তখনো তুমি কাজ করে' চলেচো, জীবনের পথে প্রত্যেকটি পিন্, প্রত্যেকটি দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচিয়ে চলেচ;—তবু তোমার রুটিতে প্রায়ই এসে পরের করুণার স্বাদ লাগচে। এতে ব্যথা লাগে। কোনো দিন অবস্থা ফিরবে এ আশা যদি ছেড়ে দাও; সব আশা, সব স্বপ্ন, সব বিশ্বাস, সব মরীচিকা যদি বিসর্জ্জন দাও, তা'হলে নিশ্চয়ই তুমি বলবে, এতদিনে শেষ অবস্থায় এসে পৌছলুম।—কিন্তু না; এখনো তোমার সত্তার আসল মূলই বাকী রয়ে গেল; সব চেয়ে যা দামী বস্তু তাই পড়ে রইলো। তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করবে—সে কি?

—সেই কথাই তোমায় আজ বলতে যাচ্চি।

ঘটনাটা ঘটলো ঠিক যখন আমাদের অবস্থা একটু ভালোর দিকে চলেচে বলে মনে হচ্ছিল। কিছুদিন ধরে আমার মাথার যাতনাটা কম হয়ে আসছিল। আর আমিও একটা নতুন harrow তৈরী করবার চেষ্টায় ছিলাম।—আবার ইস্পাত। এ কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না। তুমি ত জান ইস্পাতের মাঝে কি অনন্ত সম্ভাবনাই না রয়েচে। মার্লে তখন নতুন উদ্যমে কাজ করচে। ওর মত অমন একটি মেয়ে যে স্বেচ্ছায়